আমি, অনুপম।

নবনীতা দেব সেন

ঈশান
৭৯/২ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

ও

শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্ত

শ্রীচরণেষু ॥

না, এবারে ফিরতেই হয়।

কমলকলির এলোচুলের পিছনে পাশবদ্ধ বাঁ হাতের মণিবন্ধটি একটু উঁচু করে দেখে নিলেন তিনি— সাড়ে নটা বাজে। দশটায় অম্বরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। লীগ্যাল এইড কমিটিটার মোটামুটি খসড়া একটা আজই সম্পূর্ণ করে ফেলা দরকার।

ডানহাত স্টিয়ারিঙে আবদ্ধ, বাঁহাত কমলকলিতে। আলতো করে ঠুকরে দিলেন কমলকলির কমলা ঠোঁট, তারপরে বললেন: 'এবার ফেরা যাক, কি বলো?'

—'এখনই?'

—'দশটায় একজনের আসার কথা।'

কমলকলি ঠোঁট ফোলাল, চোখে পাখি মারার ছর্‌রা ছুঁড়ল অভিমানে। কিন্তু তিনি যে পক্ষীজাতীয় জীব নন তা জানে বলেই সম্ভবত, শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে, সোজা হয়ে সরে বসল কার্যত।

—'পৃথিবীতে সকলের জন্যেই আপনার সময় আছে, কেবল আমার জন্যে ছাড়া।'

এবার হেসে ফেললেন তিনি। অল্প আদরও করে দিলেন কমলকলিকে। হাসলে তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা আকস্মিক অভাবিত বদল ঘটে যায়। তাঁর ধীর গম্ভীর স্বভাবের সঙ্গে এই ছেলেমানুষী শুভ্র হাসিটা ঠিক খাপ খায় না। ফলে আকর্ষণটা অবশ্য বেড়েই যায়। ডান কোণের শ্বদন্তটি সোনা বাঁধানো, ছেলেবেলায় পোকায় ধরেছিল। তাই সহজে বেশি হাসেন না তিনি। ওই সোনা বাঁধানো দাঁতটা তাঁর লজ্জা।

—'বাঃ, এটা কিন্তু আনফেয়ার হল। সেই আটটা থেকে সাড়ে ন'টা। আর বলছ, তোমাকে সময় দিই না?' তাঁর স্বরে একটা মাদকতা আছে। কমলকলির ঘোর যেন কাটতে চায় না। সে ঠোঁট ফুলিয়েই থাকে, ফোটা পুটুসফুলের মতো।

—'কেউ কোনোদিন আমাকে ভোর সাড়ে সাতটায় উঠে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে দেখেছে? হেন অঘটনও ঘটল তোমার জন্যে, আর তুমিই বলছ কিনা—'

এবার কমলের ভুবনমোহিনী হাসি ভ্রূ থেকে চিবুক পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়। তিনিও পথের দিকে মন ফেরালেন। তাঁর বাঁহাতটা এখনো আলগাভাবে কমলকলির কাঁধে। এবারে সরিয়ে নিতে হবে, গীয়ার বদল করা দরকার। মুঠো করে ধরলেন স্লিভলেসের দু' সুতো আচ্ছাদনের অজুহাতের নিচে প্রস্ফুটিত কমলের গোল মাংসল কাঁধ—মুঠোটা এবার আলগা করবেন, তারপর মুঠো ফিরে আসবে গীয়ারের ঠাণ্ডা কঠিন দণ্ডে। এ-সব প্রণয়ের পদ্ধতি যেমন তাঁর রপ্ত আছে, কমলকলিরও এ পাঠ বেশ ভালোই অধিগত। এই কারণেই তিনি কমলকলির মতো মেয়েদের পছন্দ করেন। এই কমলকলিরা যতক্ষণ কাছে থাকে, শুধু ততক্ষণই কাছে থাকে। নেমে যাবার পরেও মনে মনে তাড়া করে আসে না শোবার ঘরে, স্নানের ঘরে, পড়ার ঘরে, জবরদখল নিতে চায় না মনের। সময়ের। সেই ধরনের মেয়েদের তিনি পছন্দ করেন না। তার লক্ষণ মাত্র দেখা গেলেই সচকিত হয়ে ওঠেন, এবং দ্রুত হাতে দু' আঙুলের টোকায়, কোট থেকে শ্যামাপোকার মতো, মন থেকে তাদের ঝেড়ে ফেলেন। কিছু কিছু অবশ্য ব্যতিক্রম হয়ে যায় না তা নয়। চকখড়ির গুঁড়োর মতো মাখামাখি হয়ে যাবার, সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা কিছু মেয়ের থাকে। যেমন ছিল মারিয়া, যেমন সুধা। এদের ব্রাশ করে ফেলতে একটু সময় বেশি চলে যায়। তবে মাঝে মধ্যে নারী অবশ্য মন্দ নয়। একটু ছায়াঘন অবকাশ। একটু তাৎক্ষণিক স্নিগ্ধতা। মাত্র এই। বহু ধরনের কাজ, নানা দায়িত্ব। তাঁর সময় মহার্ঘ।

দেশশুদ্ধ লোকের মতো সে কথা কমলকলিও জানে। আর জানে বলেই, অধুনা এই বিশেষ ভাগ্যোদয়ের সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন।

শেখানোটা একেবারেই অপব্যয়— ও কোনোদিনই গাড়ি চালাবে না। কাজে লেগেছে কেবল দেড় ঘণ্টার মধ্যে শেষ পঁচিশ মিনিট। না, শরীরের প্রয়োজন তাঁর বিশেষ নেই— তুচ্ছ শরীরকে তিনি বিশিষ্ট মূল্য দিয়ে অযথা জরুরী করে তুলতে রাজি নন। তাই বলে তো সাধু-সন্নিসিও নন তিনি? মাঝে-মধ্যে একটু মনের ছুটি'ও তো লাগে। একটু মননহীন অবকাশ। অনুপমের কর্মশৃঙ্খলিত জীবনে নারীর অনিবার্যতা নেই। যেমন মদ, যেমন সিগারেট, তেমনি নারী। অবসর বিনোদনে আরামপ্রদ, মাঝে মধ্যে হলে ভালোই, আবার না হলেও দিব্যি চলে যায় দিন। কফি ছাড়া সত্যি কোনো নেশা নেই তাঁর। তাঁকে মাতাল করতে পারে নি কোনোদিন মদ কি নারী, খ্যাতি কিংবা প্রতিপত্তি। তাঁর হাতে ধরা আছে সমস্ত কটি অশ্বের রজ্জু —সর্বত্র দাঁড়ি টেনে রেখেছেন। মাতালের কোনো বর্মচর্ম নেই, সে বড়ো নিরস্ত্র, বড়ো নগ্ন বড়ো শ্রীহীন। তার বুদ্ধিশ্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। যেখানে বুদ্ধির জোর খাটে না সেখানে অনুপম রায় নিজেকে ঠিক খুঁজে পান না। বুদ্ধিই বল, বুদ্ধিই মানুষ। দুর্বলে অনুপমের রুচি নেই। রূপসী কোনো বুদ্ধিহীনার চেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষ সংসর্গ তাঁর কাছে ঢের বেশি কাম্য। তবে মেজাজটা মাঝে মাঝে নারী নারী করে উঠলে, মুখশুদ্ধির মতো খুঁজে নেন একজন কমলকলি কি নলিনী দেশপাণ্ডে, কি প্রমীলা রোহাদগীকে। তবে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ দেন না। না বাবা, ওদিকে অনুপম শক্ত আছেন। নিজের হৃদয় তার নিজের মুঠোয়। এই যেমন নেশা-টেশায়, তেমনি হৃদয়-ফিদয়ের অস্বচ্ছ এলাকাতেও। ওদিকে বড়ো ঝড়ঝাপটা, বড়ো অনিশ্চয়তা। আর ও অঞ্চলটায় বুদ্ধি বড়োই অক্ষম। অনুপম তাই সযত্নে পরিহার করে চলেন সর্ববিধ হৃদয়-জাতীয় পরিস্থিতি। ফলে তাঁর সৌজন্যে ত্রুটি হয় না, কর্তব্যে বিচ্যুতি হয় না। জগতে ভদ্রতা ব্যাপারটা কেবলমাত্র সংযম আর সহনশীলতা এই দুইয়ের

রসায়নে প্রস্তুত, দুটিই অনুপম রায়ের স্বভাবসিদ্ধ। যথেষ্ট বুদ্ধি যার আছে, তার ধৈর্যও আছে। তার সংযম থাকবে সহ্য থাকবেই। প্রকৃত, বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে তাই অভদ্র হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় মাতলামি করাও। অথবা প্রেম-পাগলা হয়ে আত্মহত্যা করা।

এই-সব বিষয়ে মনের চিন্তা ও ধারণাগুলি পরিচ্ছন্ন বলে অনুপম রায়ের মনে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তাঁর জীবন স্বাধীন। তিনি জগতের কারুর কাছেই নিজের সমপরিমাণ বুদ্ধি-বিবেচনা আশা করেন না। রাগ দ্বেষ হতাশা ক্ষোভ এই-সব চিত্তবিকার অদূরদর্শিতার ফল, সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন কোনো পরিস্থিতিই চরম নয়, সকল অবস্থারই শেষ আছে, পরিবর্তন আছে।

অনুপম আত্মরক্ষায় পটু। তা সত্ত্বেও সকালে একটু বেশি সময় গেছে কমলকলির কাছে। কাল অতক্ষণ সময় দেবেন না অনুপম।

আগে সঞ্জীবের জন্য ম্যাটারটায় চোখ বোলানো যাক। একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন, কয়েকটা প্রুফ সংশোধন করলেন, খামে ভরলেন। তারপর আবার বের করলেন, আরেকবার পড়ে বেশ তৃপ্তিবোধ করলেন। বেশ কড়া, বেশ 'খরশাণ' হয়েছে লেখাটা। জমেছে। খামে পুরে-লেখাটা সরিয়ে রেখে অন্য একটা ফাইল টেনে নিলেন। তর্জনীতে চশমাটা ঠেলে যথাস্থানে তুলে দিলেন, তারপর পোর্টেবল ইতালীয় টাইপরাইটারের সিল্ক রিবনের কালো ঘূর্ণিতে, হারিয়ে গেল রাস্তায় ফেরিওলার পুনরাবৃত্ত হাঁক, জানালার মাথায় শালিকপাখির ডাকাডাকি।

মিটিং থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছিলেন অনুপম। সঙ্গে আছে নীলাব্জ, ললিত আর সতী। বসেই নীলাব্জ বলল— তোমার গলাটা আজ ধরাধরা লাগছে।

অনুপমও সেটাই ভাবছিলেন। গলাটা হঠাৎ ধরে গেছে আজ। বেশ কিছুদিন চল্লিশ পেরিয়েছেন। শীতদেশে কিঞ্চিৎ তুষারপাত

সোমশংকরই আবার বললেন : 'দেখুন কিটব্যাগটাতে ইনক্রি-মিনেটিং মেটিরিয়ালস থাকলে আপনাকে মুশকিলে পড়তে হবে।'

অর্ধভুক্ত সব সুখাদ্য পাতে পড়ে রইল। ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে এবার জিনের গ্লাস মুখে তুললেন অনুপম রায়।

—'কী হল? বেশি শক্ত বুঝি?' বলতে বলতে যত্ন সহকারে ধীরেসুস্থে টোমাটো এবং লেটুস সমেত শেষ মাংসের খণ্ডটি মুখে পুরে সোমশংকর অনুপমের দিকে তাকিয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বলেন—'শক্ত হবে না?—যা বাজে কোয়ালিটির মাংস। এ দেশে তো কোয়ালিটি কণ্ট্রোল বলে কিছু নেই। আপনার হুটোর সময়ে কিসের লেকচার—জর্নালিজমের না পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের?'

অনুপম রায় বললেন—

—'কিটব্যাগটা জমা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা আমার ছাত্র।'

একগাল হেসে ফেলে সোমশঙ্কর অগাধ স্নেহের সঙ্গে বলেন : 'কী মুশকিল। একটু তো প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে? ওদের কাছে আপনিও কিন্তু শ্রেণীশত্রু। বুঝলেন? ডোণ্ট ফরগেট ছাট। ওটা নিজেই থানায় জমা দিয়ে দিন। আজই তা হলে সার্চ হলেও কোনো কেস হবে না। ঝামেলা চুকে যাবে।'

অনুপম রায়ের চোখে ভেসে উঠল খাবার টেবিলে সমীরের হাসি হাসি চোখ। হাতের স্ফটিকপাত্রে স্বচ্ছ শীতল পানীয়, তার মধ্যে ডুবছে ভাসছে শ্যামল সতেজ তাজা লেবুর চাকতি। ওতে কি অনুপম রায়ের ঘোলাটে চশমাপরা মুখখানাও ডুবছে আর ভাসছে? হাবুডুবু খাচ্ছে? কী করবে তুমি এখন অনুপম রায়? সমীরের কিটব্যাগের মধ্যে অনুপম রায়ের ভবিষ্যৎ চাবি দেওয়া আছে।

কী সব যেন বলছেন সোমশংকর।

—'আপনার মতো মানুষের কাছে দেশের কত আশা। এ-সব

ছোটোখাটো বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। এসব হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা।'

আগুন নিয়ে ওরা খেলতে পারে আর তুমি খেলতে পারো না বুঝি? অনুপম?

—'আপনার 'সাউথ এশিয়ান বুলেটিন'-এর লেখাটা দেখলাম। চমৎকার হয়েছে। সত্যি য়ু আর আ ব্রিলিয়াণ্ট অ্যানালিস্ট। 'নিউ লেফট রিভিয়ু'-তে কিন্তু আমার মনে হয় আপনি একটু বেশি বেশি যেন ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়েছেন— তাই নয় কি? বুঝলেন না, আপনাদের কলম পৌঁছয় দেশ-বিদেশে, আপনাদের কলমের খোঁচাতেই তো দেশের ইমেজের বাঁচামরা— উই ব্যাডলি নীড য়োর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম অ্যাট দিস ক্রিটিকল আওয়ার।' কী আশ্চর্য! সোমশকংর দত্তরায় অনুপমকে ডেকে এনে এত উপদেশ দেবার কে? কী জানে সে? নেহাত অ্যাকাডেমিক বলেই তাঁকে খাতির করে ডেকে এনে মদ্য মাংস সহযোগে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে— রেয়াৎ করা হচ্ছে সন্দেহ নেই। এটা সোমশংকর নিজে থেকেই করেছেন— রাজার প্রতি রাজার আচরণ। বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিজীবী না রাখিলে কে রাখিবে?

—'প্লীজ ডোণ্ট টেক ইট আমিস্— আমার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথাটা বলে নেওয়াই ভালো। দে আর ফাইটিং আ লুজিং গেম, দে ক্যান নেভার উইন।'

হেরে যাওয়ার খেলা? অনুপম? তুমি জিততে পারবে না? বাদলের মুখখানা মনে করো। দীপুর! সমীরের সেই খুদে দাঁত দুটো মনে করো। কালও মিটিংয়ে কী বলে এলে মনে করো। সঞ্জীবকে যে লেখাটা দিলে সেই নিবন্ধে কী লিখেছ মনে করো। সেটা আজ কম্পোজড হবার কথা এতক্ষণে। অনুপম, তুমি কিটব্যাগ জমা দিয়ো না। ওটা বরং দর্জিপাড়ায় রেখে এসো। অবশ্য সেখানেও সার্চ হবে।

এক সুধা। হ্যাঁ। সুধাই রাখবে। কিন্তু সুধা তো···আচ্ছা, কিটব্যাগটা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেললে কী হয়? অথবা ঢাকুরিয়া লেকে?

ওয়েটর এসে প্লেট তুলে নিয়ে, মেনু রেখে গেল। মেনু দেখতে দেখতে সোমশংকর দত্তরায় বললেন—'একটা ট্রাইফ্ল নিন।' অনুপম মাথা নেড়ে না করলেন।

—'তবে একটা পীচ মেল্‌বা? চকোলেট সান্‌ডি? বানানা ফ্রিটার্স? কিচ্ছু না?'

অনুপম না-সূচক মাথা নেড়ে যান। মেনু ফেরত দিয়ে, টেবিলে পাউচ রেখে বলকান সোব্রানি তামাক পাইপে ভরছেন সোমশংকর:

—'কফি?'

—'কফি একটা বরং চটপট খেতে পারি। ব্ল্যাক।'

—'কনিয়াক দুটো, আর ব্ল্যাক কফি ডেমি-তাস দুটো। আর এক প্যাকেট ইণ্ডিয়া কিং। একসঙ্গেই বলে দিলাম, আপনার তো আবার তাড়া রয়েছে। লেকচার না এখন?'

অনুপমের হঠাৎ সোমশংকরের সাহচর্য অসহ্য লাগে। এখনো কফি খেতে হবে, এখনো কনিয়াক, লৌকিকতা আরো বাকি! ভাবতেই তাঁর দেহের মধ্যে একটা আপত্তি ঘুরপাক খেয়ে গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইল। অনুপম, তুমি এইটুকুতেই ধৈর্য হারাও? সোমশংকর তো ফ্রেণ্ড। দেখছ না কেমন ফ্রেণ্ডলি টক, কেমন ফ্রেণ্ডলি স্মাইল। ফ্রেণ্ড না হলে কি তোমাকে সতর্কবাণী দিত? বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিজীবী না রাখিলে ইত্যাদি। সোমশংকর অতি যত্নে পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন, মহার্ঘ বিলিতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে, তাঁর করুণারই মতো ঘরের আবহাওয়াকে শাসিত করছে।

কফি, সিগারেট ও কনিয়াক এসে পড়ল। স্বাদু পানীয়ে মুখ ডুবিয়ে গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলে যেতে লাগল অনুপম রায়ের। সোমশংকর তাঁকে ইণ্ডিয়া কিং অফার করেছেন। যত্ন করে গ্যাসলাই-

টার দিয়ে মুখাগ্নি করে দিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রের তামাক বিষয়ে আলোচনা শেষ করে সোমশংকর এখন কনিয়াকের সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছেন। থ্রি স্টার ফাইভ স্টার ভি এস ও পি শ্যাম্পাইন কনিয়াক। এসবই জানেন অনুপম। এসবই বহু-বহুবার বলেছেন অনুপম রায় নিজেই। নানান পার্টিতে। সর্বত্রই তো এই একই খেলা। চক্রবৎ কথোপকথনের মালা ঘুরে চলে পার্টি থেকে পার্টিতে—মুখ থেকে মুখান্তরে—একই বিস্ময়—একই প্রশ্রয়—একই রসিকতা—এক গসিপ—একই বিনয়াবনত অহমিকা— শুধু কথামালা—শুধু শব্দমালা — সময় চলে যাচ্ছে— কিটব্যাগটা কি জমা দিতেই হবে? অনুপম ছাই ঝেড়ে সোজা হয়ে বসেন: অনুপমের গলার মধ্যে কেমন একটা বোজাবোজা মজাপুকুরের মতো ভাব— কেউ যেন মুঠো করে টিপে ধরছে বুকের ভেতর থেকে তাঁর কণ্ঠনালী। গলাটা ঝেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার— তারপর ধরা গলাতেই বললেন, 'ধন্যবাদ, খবরটা দিয়ে ভালো করলেন। দেখি এখন কীভাবে ছেলেটাকে সাবধান করে দিতে পারি। ওই ব্যাগ নিতে চলে এলে তো ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে সে'— (আজই, আজই তো আসবে সমীর)···স্নেহ-বিগলিত হাসিতে গোঁফ কেঁপে যায় সোমশংকরের: 'দূর মশাই, আপনারা সত্যি বড়োই ছেলেমানুষ। কাগজে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেন এত জটিল সব পলিটিক্যাল মুড-এর, আর এটুকু ধরতে পারছেন না? যে ছেলে আপনার বাড়িতে রোজ আসছে, তাকে কি আমরা ইচ্ছে করলে ধরতে পারি না?'

—'তবে?'

—'আরে ওকে ফলো করেই তো আমরা অনেকগুলো ঘাঁটির খোঁজ পেয়েছি। বড্ডো কেয়ারলেস ছেলে। কিছুই টের পায় নি, মাস খানেক ধরেই ওকে আমরা টেইল করছি! বাই দ্য ওয়ে— আপনার কলামটা সত্যি অসামান্য স্টাইল, কিন্তু ওরিয়েন্টেশনটা যদি আর

একটু, মানে ন্যাশনাল ফ্রন্টটাতে আরেকটু কনস্ট্রাকটিভ হওয়া আর কি — ওদের প্রতি বেশি সিমপ্যাথি না দেখানোই ভালো··· সরকার খুব স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিয়েছে···'

—'ধন্যবাদ। আমাকে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাকে উঠতেই হচ্ছে। বেয়ারা— বিল আমার একাউন্টে যাবে।'

'সার্টেনলি নট। ডোণ্ট বি অ্যাবসার্ড। আপনি হলেন আমার গেস্ট— আরে মশাই এইখানে আমার গেস্ট হতে আপত্তি কিসের? আমাদের 'অন্য' গেস্ট-হাউসটিতে তো আপনাকে আতিথ্য দিচ্ছি না? ···হা হা হা হা, সেইটেই যাতে না হয় সেজন্যেই তো আজ ডাকলাম– হা হা হা হা হা'···

সোমশংকরের প্রাণখোলা হাসি প্রায় জনশূন্য হলঘরটির অভিজাত শান্তিকে মুহূর্তে চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলল।

কাঁচা হাতের পাস্টোরাল অনেকক্ষণই থেমে গেছে— সেই হাসি অনুপমের বুকের লক্ষ্যে স্টেনগানের ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠার মতো ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, পুনঃধ্বনিত হতে থাকল।

উদ্‌বিগ্ন ছেলেমেয়েদের চক্রব্যূহ ভেদ করে কোনো রকমে বেরিয়ে এলেন অনুপম রায়। কিছু ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে আসছে। আজ লেকচার দিতে দিতে হঠাৎ বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। একেবারেই হঠাৎ। মধ্যপথে 'এক্সকিউজ মি' বলে বেরিয়ে এসেছেন অনুপম। ক্লাস শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রদের সঙ্গদানে নিবৃত্ত করলেন গাড়িতে উঠে। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে বসে প্রথমে ভাবলেন— এখন কোথায়?

দর্জিপাড়াতেই যাওয়া যাক। একবার ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে। দর্জিপাড়ায় তাঁদের পুরোনো ডাক্তার আছেন। গলায় ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগল, না কী হল সেটা জানা দরকার। তার পরে? তারপরে কোথায়?

অনুপম রায় কি আইনের চেয়ে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারেন না? সরকার স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিলে অনুপম কি স্টার্নার অ্যাটিচ্যুড নিতে পারেন না? না। পারেন না। আফটার অল, তিনি ব্যক্তিমাত্র, ওনলি অ্যান ইনডিভিজুয়াল। তিনি তো একটা ইনস্টিট্যুশন নন।

—কিটব্যাগটা—

দর্জিপাড়াতে পৌঁছেই অনুপম কেষ্টকে ফোন করে বলে দিলেন, সমীর এলে তাকে যেন তার কিটব্যাগটা দিয়ে দেয়। এবং সমীরকে রাত্রে অন্যত্র শুতে হবে, কেননা মা যাচ্ছেন অনুপমের সঙ্গে আজই।

ওটুকু বলতেও গলায় বেশ কষ্ট হল। ডাক্তারবাবু ছিলেন না; যাক, কাল হবে। মা-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন অনুপম।

বাড়িতেঢুকেই জানলেন—না, সমীর আসে নি। কিটব্যাগ খাটের তলা থেকে জুলজুল করে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে আশা করছিলেন, বাড়ি ফিরে দেখবেন সমস্যা আপনা আপনি মিটে গেছে, যার কিটব্যাগ সে এসে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ তো অযৌক্তিক আশা, ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের মতো। তা হলে কি এবার? এখন বরং একটু কনিয়াক কি হুইস্কি হলে মন্দ হত না। কিন্তু হবে না। মা। মনটা এবার তৈরি করে নিলেন অনুপম। সহজভাবে কিটব্যাগটি হাতে নিয়ে যথাসাধ্য স্পষ্ট গলায় বললেন— 'কেষ্ট, আমি একটু বেরুচ্ছি। সমীর-বাদলরা কেউ এলে দরজা খুলে দেবার দরকার নেই।'

কেষ্ট রান্নাঘরে ছিল। ঠিকমতো শুনতে পায় নি ভেবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।—'কী বললেন, দাদাবাবু? দরজা খুলে দেবার…' বলতে বলতেই কেষ্ট বেশ বুঝতে পেরে গেল, সে ঠিকই শুনেছে। অনুপম স্পষ্ট দেখলেন, কেষ্টর এক চোখে জটপাকানো অবিশ্বাস, অন্য চোখে ভর্ৎসনা।

অনুপমের কোনোকালে যা হয় না, তাই হোলো। অসহিষ্ণু

গলায় বললেন—যদিও সেগলা প্রায় বুজেই এসেছে—'যা বলছি তাই করবে। যাকে-তাকে দরজা খুলে দিতে হবে না।'

জুতোর অধীর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন অনুপম—গাড়ির দোর বন্ধ করার 'ঠাশ্' শব্দ হয় খুব জোরে। দাপিয়ে স্টার্ট দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনুপম রায়ের রুদ্ধশ্বাস গাড়ি, সমীরের কিটব্যাগ সমেত। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো, মোড়ের বাঁকে তার চিহ্ন মিলিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

থানা থেকে বেরিয়ে অনুপম সোজা গেলেন 'ডেইলি নিউজ'-এর অফিসে। কাল সঞ্জীবের হাতে যে ম্যাটারটা দিয়েছিলেন তার খোঁজ করতে। না এখনো কমপোজড হয় নি। প্রেস থেকে তুলে আনলেন লেখাটা। একটু অদল-বদল করতে হবে, এ্যাপ্রোচটা পালটে দেওয়া দরকার।

কাগজের অফিসে পুলকের সঙ্গে দেখা হোলো। দস্তুরের সঙ্গেও। দস্তুর ওঁকে দেখেই ডাকলেন,— 'চলুন আমার সঙ্গে আজ একটা সেসন হোক, অনেকদিন বসা হয়নি।' পুলক ইংরিজি কাগজে প্রুফরীডার, আর বাংলা কাগজপত্রে গল্প লেখে। শুনেছেন বেশ নামও করেছে। অনুপম অবশ্য সে-সব পড়েননি। সময় কোথায়। কিন্তু পুলক ছেলেটাকে বেশ লাগে তাঁর। দিব্যি সিনসিয়র ধরনের। দস্তুরের কাছে মার্জনা চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন অনুপম। তারপর পুলককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওরা কী লিখছে-টিকছে কী ভাবছে-টাবছে শোনা উচিত মাঝে-মাঝে।

বুকের ভেতরটায় কেমন একটা দমবন্ধ ভাব হচ্ছে আজ। অনুপমের মনে হলো মুক্তি চাই, চাই একটু স্বাস্থ্যকর নিশ্বাস-বায়ু। গ্রীন ড্রাগন এদিক থেকে ভালো। লনে বসা যায়।

আঃ! একটু খোলা হাওয়ার জন্য অনুপমের বুকে গলায় তেষ্টা। বুকের মধ্যে ঢেউ তুলে আছড়ে পড়লো একটা সুর— তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে ··ছিন্ন করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, কিন্তু অনুপম আমল দিলেন না। দূর! যতো অ্যাবসার্ড আইডিয়াজ— ডুবতে রাজি কেউ কখনো থাকে? ইচ্ছে করে কাছি ছিন্ন করে না কেউই।

বার বার মাছি তাড়ানোর মতো হটিয়ে দেন তবু নাছোড় সেই খোলা হাওয়ার গান অনুপমের বুক গলার মধ্যে কুমারের চাকের মতো পাকের পরে পাক দিতে থাকে।— ভিতরে-ভিতরে গড়ে উঠতে থাকা পাত্রটিতে ভেঙে ফেলতে চেয়ে জোর করে অন্য কথায় যান অনুপম ঃ

—'তারপর? কী লিখচেন টিকচেন আজকাল? নতুন কিছু—?'

—'একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছি।'

—'বাঃ, একসেলেণ্ট! নিশ্চয় দারুণ হচ্ছে।'

—'দেখা যাক কপালে কী আছে।'

—'কপাল আবার কি? আপনি যখন লিখছেন, সে-লেখা সিদ্ধ হবেই।'

— 'তার কোনো মানে নেই। আমার কাজ তো কেবল মিস্ত্রির। বাকী কাজ অন্যের হাতে।'

—'মানে? রীডারশিপের রুচির কথা বলছেন? আপনার অন্তত রীডারশিপের হাতে নিজেকে দেওয়া উচিত নয়।'

—'সিদ্ধি যাঁর হাতে তাঁর হাতে যদি নিজেকে একবার ছেড়ে দেওয়া যেতো, তাহলে তো মিটেই যেতো সব সমস্যা। সেইটেই যে পেরে উঠছি না।'

ইতিমধ্যে তাঁদের পানীয় এসেছে। বরফটা আজ বাদ দিয়েছেন গলার জন্য অনুপম রায়।

বরফবিহীন পানীয়টি বড়োই বিস্বাদ লাগছে। সত্যিই এর চেয়ে এক কাপ গরম কফি খেলে হোতো। গলাটা কে যেন মুঠোয় চেপে ধরছে থেকে থেকেই। অকস্মাৎ পুলকের পিঠের ওপরে একটি সশব্দ থাবড়া—

—'কী মশাইরা কী হচ্ছে ওখানে? গুজুর-গুজ, ফুসর-ফুস? লুকিয়ে লুকিয়ে দুজনে মিলে রঁদেভু্য? খাওয়া-দাওয়া? পুলক, হেভি যক দিচ্চিস আজকাল অনুপমবাবুকে, অ্যাঁ?'

—আঃ। অনুপম নিরুপায় চোখে দেখলেন রমেনের টিপিক্যাল আবির্ভাব ঘটেছে। এই সন্ধ্যা রাত্রেই আধামত্ত।

—'কী নিয়ে কথা হচ্ছিলো, শুনতে পারি?'

—'পুলকের লেখাটেখা নিয়ে।'

—'ঠিক তা নয়। সিদ্ধিলাভ ও ঈশ্বর বিষয়ে।'

—'তাই বলুন! পুলকের ঈশ্বর। আমি বলি স্বয়ং ঈশ্বর বুঝিবা! পুলকের ঈশ্বররা তো সকলেই ঈশ্বরী।— ঈস্স্বরী।'

বলতে বলতে রমেন দুই হাতে শূন্যেই ভাস্কর্য গড়ে। বাঁ-চোখ মেরে হাসে।

—'মোটেই না। রমেনদা, তুমি সব তাতে ও-সব বাজে ঠাট্টা কোরো না তো।'

—'তুই শ্যালা বড্ডো লম্বালম্বা বুলি ঝাড়তে শিখেচিস্ আজকাল। বল্, ক' তাড়া প্রুফ দেখলি আজ? হ্যাঁ? ক' ঘণ্টা? বল্?'

অনুপম বুঝলেন এটা বেল্টের নীচে আঘাত করা হোলো। পুলক নিজেকে শিল্পী বলে বিশ্বাস করে। প্রুফ রীডারের প্রসঙ্গটা মনে করতেই ভালো লাগে না তার। রমেনের ওপর তাঁর মনটা আরো বিরূপ হলো। যুক্তির অভাবে এ হচ্ছে দুর্যুক্তি-প্রয়োগ। শক্তির অভাবে চালাকি। অনুপম বললেন:

—'পুলক এখন একটা উপন্যাস লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছে।'

—'আই সী ?'

রমেন দাঁড়ি-গোঁফের ফাঁকে দাঁত দেখিয়ে হাসে।—'দাও টু ব্রুটস, আট পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ অধ্যায় ? এবার পুজোর নবতম সম্পূর্ণ উপন্যাস ?' গড্ ব্লেস দী চাইল্ড, অ্যাণ্ড দাই রীডার্স্ টু ! ঈশ্বর ! ইহারা জানে না ইহারা কী করিতেছে !'

—'রমেনদা, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ?'

ঈষৎ আলটপ্কা প্রশ্ন করে বসে পুলক।

—'নো স্যার। আই ডু নট বিলীভ ইন এনি আনআর্থলি ক্রীচার অর ক্রিয়েটর। বুঝেচ ?' বলেই রমেন পুলকের পানীয়টুকু সাবধানে নিজের গলায় ঢেলে নেয়। সেদিকে দৃক্পাত না করে পুলক বলে ঃ

—'নিশ্চয় করো। তুমি না শিল্পী ? আলবৎ করো। তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করা-টরা সব বাজে কথা। অমন ছবি তুমি কখনো আঁকতেই পারতে না বিশ্বাস না হলে।'

—'কেন রে ? সে ব্যাটা তো আগে কেবল বইটই লিখতো, চারখানা বেদ, দু'খানা বাইবেল, ওহ্ গাদা সব বই লিখেছে। আজকাল আবার ছবিটবিও আঁকছে নাকি ? অ্যাঁ ? হ্যাঃ হ্যাঃ।'

—'রমেনদা, তোমার বয়েস কতো হলো ? চল্লিশ নিশ্চয় পেরিয়েছো ?'

—'কেন ?' নিকেল ফ্রেমের ক্ষুদ্র চশমাটাকে দাড়ির জঙ্গল থেকে উদ্ধার করতে করতে রমেন বলে—'এটাকে কি চালশের মতোন দেখাচ্ছে, নাকি চোখ দুটোকেই চশমার মতো ?'

—'রমেনদা, একটু নিজের দিকে চাও দিকি এবার। এটা তোমার দুর্বিনয় নয়—এটা আত্ম-অশ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা এবং বিনয় এই দুটোই হচ্ছে শিল্পের আলো আর বাতাস রমেনদা।'

—'থাম্ বাবা, আর ব্রাণী দিস্নি। কই অনুপমবাবু, তিনটে বি কে অর্ডার দিন তো দেখি ?'

সত্যি, অনুপমেরও বাজে লাগছে। এরা কী সব এলেবেলে আলোচনা করছে, পুলকের সঙ্গে না এসে দস্তুরের সঙ্গে—কিংবা বাড়ি ফিরে পেপারটা লিখলে কাজে দিতো। বিকেল বেলায় বাতাসটাও দেয়নি এখনও পর্যন্ত। এক একদিন এরকম হয়। হাওয়া দেয় না।

—'রমেনদা, প্লীজ তুমি একবার নিজের দিকে চাও। অমন নড়বড়ে মন নিয়ে কি শাশ্বত কিছু তৈরি করা যায়?'

—'আইব্বাস। এ যে হাই ফিলসফি? কে গো তুমি? মহর্ষি মহেশ যোগী? নাকি, খাস ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট?'

—'ঠাট্টা কোর না রমেনদা। ঠাট্টা করতে নেই। গীতার সেই শ্লোকটা মনে নেই, সেই যে, যেখানে বলছেন রিপুতাড়িত হয়ে মানুষ তার নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে ভগবানকে অপমান করে—আর সেই পাপীদের কী রকম ভয়ানক শাস্তি হয়···ঈশ্, আমি মনে করতে পারছি না, সেই যে···অহংকারং বলং দর্পং?'

মনে আবার নেই! হয়তো রমেন এসব না জানতে পারে; কিন্তু অনুপমের খুবই মনে আছে। অহংকারং বল দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ জানবেন না? সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শুনতে হয়নি বাবার গীতাপাঠ? বাবার ভাগবত পাঠ? কিন্তু অনুপম শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন না। পুলককে ধরিয়ে দিলেন না তার হারানো সূত্র। যেমন নিঃশব্দে বসেছিলেন, তেমনিই রইলেন।

—'না না ওসব গুলগাঁজা তোমার।' রমেনদার কিস্সু মনে নেই। মনে ছিলও না কোনোকালে। 'জ্বালাতন করিসনি বাপু। আমার কথাটা শোন্ ভাই তাচ্চেয়ে, ওসব ঈস্স্বর-ফিস্স্বরের চাইতে এমনকি মেয়ে মানুষ পর্যন্ত ভালো। বুইলি?'

মেয়েমানুষ পর্যন্ত ভালো মানে? মনে মনে নির্বাক মন্তব্য

করলেন অনুপম। মেয়েমানুষ তো ভালোই। অন্তত ঈশ্বরের চাইতে ঢের ভালো। কতো বাস্তব। ডাকলে আসে, রিয়্যাক্ট করে, ধরা ছোঁয়া যায়, একটা ট্যানজিবল ট্রুথ তো বটে! কোন তুলনা হয় না।

—'একটু সিরিয়াস্ হও রমেনদা, একটু নিজের দিকে তাকাও। এখনও সময় আছে, কেন নষ্ট হচ্ছো এরকমভাবে?'

—'শালা! তুই যে আমার বউকে হার মানালি? সে বেটিকে যতো বলি,—বেটি যা, দূর হয়ে যা, বাপের বাড়ি, যমের বাড়ি, যেদিকে দু' চক্ষু যায় চলে যা,—বেটি নড়ে না, আর কেবল এই একই কথা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, কেন নষ্ট হচ্ছো—কেন নষ্ট হচ্ছো—কানের পোকা বের করে দিলে মাইরি, বেটি মরেও না, নড়েও না। কারুর সঙ্গে বেলাবেলি ভেগে গেলেও তো পারে? এখনও দিব্যি টুসটুসে—'

—'রমেনবাবু! কি হচ্ছে!'—

ভেতরের অস্থিরতা, ক্রোধ, অনুপমের অনুচ্চকণ্ঠে বিন্দুমাত্রও তরঙ্গিত হয় না। তীক্ষ্ণ, ধাতব আদেশের আওয়াজে ক্ষ্যাপা হাতির মাথায় যেন চেনা মাহুতের ডাঙোশ পড়লো। এক মুহূর্ত সবাই চুপ। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো। ঘেরা মাঠের সাজানো ঝোপঝাড়ে ছোট ছোট রঙিন বৈদ্যুতিক জোনাকি জ্বলছে নিবছে। অন্ধকার চিরে কোথায় একটা পাখির একহারা অসময়ের কান্না শোনা গেলো—ক্লী—ব···ক্লী—ব ··ক্লী—ব।

অনুপম বেয়ারাকে ডেকে বি কে অর্ডার দিলেন ; না, তিনটে নয়, দুটো। আর বিলটাও চাই তার সঙ্গে।

—'আমি আর খাবো না, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আরেকটু থাকতে পারলে অবশ্য ভালো লাগতো। বাড়িতে মা আবার বসে থাকবেন।'

ঠোঁট ছড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করলেন ; এটা হাসি নয়, বিশুদ্ধ সৌজন্য। না, আরও থাকলে ভালো লাগতো না। ভালো লাগছে না। রমেনের খিস্তিখেউড় পুলকদের শোনা অভ্যেস আছে, অনুপমের নেই। সন্ধেবেলা নিরিবিলি একটু মানুষের মতো গল্পসল্প করতে আসা ; একটু রিল্যাক্স করতে আসা। ঈশ্বর প্রসঙ্গ কি এখানে মানায় ? এই বয়েসে ? যে বয়সের যা। প্রথম জীবনে মার্ক্সিজমের পাঠ নিতে গিয়ে নতুন করে ঈশ্বর নিয়ে ভাবতে হয়েছিলো বৈকি তাঁকেও। জগতে এমন কোনো প্রকৃত মার্ক্সিস্ট নেই যে সিরিয়াসলি একবারও ঈশ্বর নিয়ে ভাবেনি। ভেবে-চিন্তে তবেই না রিজেকশনের প্রশ্ন ওঠে ? কিন্তু তাই বলে এখনও ? দূর ! দূর !

রমেন একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু পুলক খুব উত্তেজিত। সে বলছে ঃ

—'যে মানুষ মুখে বলে আমার ঈশ্বর চাই না, সে হয় মিথ্যেবাদী, নয় সন্তপুরুষ। এ আমি কিছুতেই মানবো না যে কোনো পরাজয়ের বা সর্বনাশের মুহূর্তে, কোনো ভয়ংকর পতনের সময়ে মানুষের ঈশ্বরের কথা মনে না হয়ে পারে। মানুষ তো পারফেকশনে পৌঁছয়নি।'

—'না ভাই, থ্যাংকিংয়ু, একটা জীবন কাটিয়ে দেবার পক্ষে এই অভাগা একাই যথেষ্ট। তোমার সর্বশক্তিমানকে আমার কোনো দরকার নেই।' আশ্চর্য শান্ত, স্বস্থ গলায় রমেন বললো।

এমনিতে অসহনীয় হলেও রমেনের এই কথাটি অনুপমের মনে ধরে। আত্মবিশ্বাসকে তিনি শ্রদ্ধা না করে পারেন না। মানুষের আত্মবিশ্বাসের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফ্যালে এই অন্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানেই পরনির্ভর, পরাশ্রিত, পরাধীন। আধুনিকতা মূলত ঈশ্বরের বিরুদ্ধমুখী স্রোত।

—'রমেনদা, তুমি যদি একবারও ভালো করে ভেবে দেখতে—'

—'কে বলছে তোমাকে আমি ভালো করে ভেবে দেখিনি ?'

টেবিলে ঘুঁষি বসিয়ে অকস্মাৎ বিকট গর্জন করে উঠলো রমেন। টেবিল কেঁপে উঠলো, কিন্তু বরফের সঙ্গে কাচের গ্লাস গা-ঠেলাঠেলি করে হেসে উঠলো, ঠাট্টার।

—'যে ছেলেটা ষোলো বছর বয়সে বাপ মা আর ভগবানের অথরিটি রিজেক্ট করবার কথা একবারও ভাবেনি তার বয়ঃপ্রাপ্তিই ঘটেনি। সে অ্যাডাল্ট নয়। সে ঘরে বসে তোমার মতন কবিতা লিখবে। বুঝেচ? পঁচিশ বছর বয়েসে যে পুরুষ মেয়েমানুষ আর মৃত্যু নিয়ে ভাবলো না তার যেমন যৌবনই আসেনি এও তেমনি। অ্যায়াম্ নট্ এ ফুল, বুঝেছ ব্রাদার, আই হ্যাভ রিজেকটেড হিম লং লং এগো।'

—'ঠিক কথা! একদম ঠিক।' একটুও না-দমে পুলক দ্বিগুণ উৎসাহে বলে। অনুপম লক্ষ্য করেন তার সিগারেট পুড়ে গিয়ে ফিলটার পুড়ছে, দীর্ঘ ছাই। আঙুলটা না পোড়া পর্যন্ত পুলকের খেয়াল হবে না। একবার মনে হল বলেন, পুলক, সিগারেটটা ফেলে দিন। কিন্তু পুলকের অতি উৎসাহ দেখে কেমন যেন অদ্ভুত কুঁড়েমিতে খেয়ে বসল তাঁকে। বলা আর হলো না।

—'ঠিক।' সোৎসাহে পুলক বলে। 'কিন্তু সেই রিজেকশনেই তো ঠেকে থাকলে হবে না, যদি সেখানেই থেমে থাকো তবে তুমি অবরুদ্ধ বয়ঃসন্ধির সমস্যায় ভুগছো বলে ধরে নিতে হবে। শিল্পের মূল লক্ষ্য তো পরিত্যাগ নয়, পুনরুজ্জীবন। তুমি নিশ্চয় মানবে যে রিজেকশন নয়, রেজারেকশনই শিল্পের উদ্দেশ্য?'

এই সময়ে মৃদু আর্তনাদ করে পুলক ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে। ঘাস-মাটি বিনা প্রতিবাদে এই আগুন হজম করে ফেলে। অগ্নিকণাটি নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

আরে দূর। কী ছাই আজেবাজে আলোচনা হচ্ছে আজ। সন্ধেটাই মাটি। জগতে কি আলোচনার বিষয়বস্তু সব ফুরিয়ে

গিয়েছে? মৃত্যু-ফিত্যু, শিল্প-ফিল্প, ঈশ্বর-ফিশ্বর ভিন্ন আর কিছু নেই? কোনো জরুরি বিষয়? নাঃ, আর ইনার্শিয়া নয়। জোরে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম রায়। কিন্তু মাঠ কোনো শব্দই হতে দিলো না। স্টিলের চেয়ারে সশস্ত্র ক্ষুরের গলাও অনায়াসে চেপে ধরলো তুচ্ছ ঘাস-মাটি।

—ন'টা বেজে গেছে?—অনুপমের মাংসের ভেতরে, চামড়ার তলা দিয়ে একটি হিলহিলে শতপদী সরীসৃপ এঁকেবেঁকে দ্রুত সরে গেল।—এসেছিলো কি? সন্তর্পণে তিনটে টোকা মেরেছে। আবার। আবার। আবার টোকা। আবার। আবার। দরজা খোলেনি। চলে গেছে? কোথায় চলে গেলো সে?

কী মনে করতে করতে চলে গেলো সমীর?

॥ ৭ ॥

বাড়ি ঢুকতেই মা বললেন—'স্বরাজের বউ ফোন করেছিল। তোর যাবার কথা ছিল?'

স্বরাজের বউ—মানে কমলকলি। ধরেই নেয় রোজই কোথাও না কোথাও দেখা হবে। আজ হয়নি।

—'আর কোনো চিঠি এসেছে কেষ্ট?'

—না দাদাবাবু।'

—'এই চিঠিটা এসেছে বোধহয়।' মা বললেন, হাতে ধরা একটা খাম।—'খাটের তলায় পড়ে ছিলো।' সুধার চিঠি। হাত বাড়িয়ে নিলেন অনুপম। নেবার সময় দেখলেন মার হাত—সাদা, রোগা, রসহীন, শিরায় শিরায় ভরা, যেন একটা শুকনো পাতা। পল্লব, করপল্লব? করপল্লবেরও জরা আসে?

—'তোর গলাটার জন্য ভাবনা হয় অনু। বাথরুমে নুনজল দিয়েছি, গারগেল করে আয় দেখি। একটু কমবে নিশ্চয়।'

গার্গল করতে করতে আয়নায় হাঁ-টা দেখা যায়। একটা গর্ত, ভেতরে দাঁতগুলো অদ্ভুত জান্তব, মাংসল জিভ নড়ছে, ওপরে নাকের ফুটোয় দুটো অন্ধকার নল। কী বিশ্রী। এই রকম কি কমলকলিকে দেখায়, সে যখন গার্গল করে? অনুপম চোখটা চালান করেন ছাদের দিকে।

একটা টিকটিকি। ফর্সা। চিকন গা। চোখ দুটো ভাবলেশহীন কাঁচের পুঁতির মতন। দূরে একটা পোকার দিকে বদ্ধদৃষ্টি। পোকাটা ছাই নড়েও না। গার্গল করা বন্ধ করে অনুপ হাত নাড়েন, হুশ্‌হাশ করেন। পোকা শুনল না। তাক থেকে কাগজের কোণ ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ছোঁড়েন। টিকটিকিটা সরসরিয়ে সরে গেল। 'সরীসৃপ'। পোকা নড়ল না। আবার মুখ নিচু করলেন, জল নিলেন, ফের ঘাড় উঁচু করতেই দেখলেন টিকটিকির মুখের মধ্যে ঝাঁকুনি খাচ্ছে পোকাটা। ধুস্‌। ঠিক হয়েছে। বোকাদের যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। এতবার সাবধান করলেন পোকা যদি না শোনে! অনুপম কী করবেন।

গার্গল করেও গলা ছাড়ল না। 'মা' বলতে গিয়ে 'হ্ম' জাতীয় একটি জটিল আওয়াজ নির্গত হতেই মা বললেন, 'অনু, ডাক্তারবাবুকে ফোন কর। কালই যাও। আমার এটা ভাল ঠেকছে না, বাপু।'

অনুপম এ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে যাবেন কাল সকাল আটটায়।

খাবার সময়েও কেষ্ট কিছু বলল না।

অনুপমও প্রশ্ন করলেন না।

কেউ কি এসেছিল?

কেউ কি আসেনি ?

কেষ্ট শুধু পুতুলের মত খেতে দিল।

কেষ্টর বকবকমটা আজ বন্ধ রয়েছে। অনুপম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। মা সামনে বসা। তখনই শোনা গেল, দরজায় টোকা পড়ছে।

অনুপমের হাত মাছের বাটিতে স্থির হয়ে গেল। কেষ্ট আসছিল, হাতে ভাতের পাত্র। হঠাৎ চুপ করে দাঁড়াল।

আবার টোকা। অনুপম প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারছেন কেষ্টর দৃষ্টি লেজার বীমের মত তাঁর কপাল ভেদ করে হাড় মাংসের গভীরে ঢুকে মাথার ভেতরটা লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।

আবার। আবার টোকা জোরালো হচ্ছে। যেন মাথার মধ্যে গোলাবারুদ, কামান ফাটার আওয়াজ। অনুপমের ইচ্ছে করল অনড় হাত দুটোকে সোজা মাথার ওপরে তুলে ধরেন, চীৎকার করে বলেন,—কেষ্ট তুমি ওভাবে তাকিয়ে থেকো না, আমি পারছি না। আই সারেন্ডার।

মা বললেন—'ও কিরে, খাওয়া বন্ধ করলি যে ?—কেষ্ট, ভাতটা দে ?' মা টোকা শুনতে পাচ্ছেন না।—মা, তুমি শুনতে পাচ্ছো না ? তোমার বয়েস হয়েছে। কানে কম শুনছো আজকাল। তাই বেঁচে গেছো। মা, তুমি আমার এই চীৎকারও কি শুনতে পাচ্ছো না ? তুমি কেষ্টর বেয়নেট চালানোও কি দেখতে পাচ্ছো না ? মা ? ছেলেবয়েস থেকেই তুমি আমার কোনো আর্তনাদ শুনতে পাওনি মা—কোনো অস্ত্রাঘাত দেখতে পাওনি। আমার সব ক্ষত, আমার সব রক্ত, তোমার চোখে অদৃশ্যই থেকে গিয়েছে। এবার টোকা আর পড়লো না। সুইচ বন্ধ করে দিলে সিনেমাতে যেমন ক্রিয়ার মধ্যস্থলে চিত্রার্পিত হয়ে থাকে মানুষ—ফের যন্ত্র চালালেই নড়ে-চড়ে ওঠে—কেষ্ট তেমনি নড়ে উঠলো। ভাতের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এলো।

অনুপম বারণসূচক হাত নাড়লেন। ভাত চাই না। মা বললেন—'কেষ্ট, তোর কী হয়েছিলো রে, আসতে আসতে হঠাৎ অমন দাঁড়িয়ে পড়লি ?'

অনুপম বলতে চাইলেন—মা চুপ করো।

কেষ্ট বললো— 'হঠাৎ যেন মনে হলো উনুনে কিছু পুড়ে যাচ্ছে'—

এমন সময় নির্ভুল বেল বাজলো। এবার টোকা নয়। কেষ্ট এবার স্থির চোখে অনুপমের দিকে। অনুপমের দৃষ্টি দরজায় নিবদ্ধ। মা বললেন— 'অ কেষ্ট, দোরটা ছ্যাখ তো বাবা— কে আবার এলো এত রাত্তিরে !'

অনুপম হঠাৎ শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—'থাক, আমি দেখছি।'

সমীর, তুমি এসো। তুমি আমার বিছানাতে শোবে এসো। আমি সারা রাত তোমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকবো। আমি জেগে থাকবো, সমীর। তোমার কিটব্যাগ আমি দিয়ে এসেছি, অমন ত্রুটি আর হবে না। আর হবে না, সমীর, তুমি এসো ভাই। 'যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'বিফোর দ্য কক্ ক্রোওজ দাও শ্যাল্ট ডিনাই মি থ্রাইস' আমি মিথ্যে করে দেবো। একবার হয়েছে, আর নয়। আমি পিটারের মতো তিনবার বলবো না— 'আই নো দিস্ ম্যান নট।' আমি যে সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় আগে পেছনে ভেবে চলি সমীর, তাই তো আমার ভুল হলো। ভাবনা করার সময় পেলেই আমি কিটব্যাগ জমা দিয়ে ফেলি। তুমি আমাকে ভাববার সময় দিও না।

দরজা খুলতেই নমস্কার করলেন অল্পবয়সী ইন্সপেক্টর।—'একটা সার্চের ওয়ারেন্ট আছে। আপনাদের একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে।'—ওয়ারেন্টসহ হাতটি বন্ধুর মত এগিয়ে এল অনুপমের দিকে।—

'আসুন।' পাশ ফিরে সরু হয়ে গিয়ে ওদের প্রবেশের জায়গা ছেড়ে দিলেন অনুপম। ইন্সপেক্টর, তিনজন সঙ্গী সমেত, বুটের শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন।

মা হঠাৎ চমকে ঘোমটা টেনে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কেষ্টর ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে গেল ইংরাজি 'O' শব্দের মত। অনুপম বললেন – 'কেষ্ট, এঁদের সঙ্গে একটু থাকো। তুমি ঘরে যাও মা, ভাবনার কিছু নেই। এটা একটা রুটিন চেক্ মাত্র। ভয় পেও না। ভয়ের কিছু নেই।'—মৃদু অভয় হাস্যে মাকে উচিত সান্ত্বনা দিয়ে অনুপম হাল্কা পায়ে ও ঘরে গেলেন।

॥ ৮ ॥

সকালবেলায় একটা রং নাম্বারের ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো। বেলা হয়ে গেছে আজ। তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র, কাগজ পড়া সেরে নিয়ে সকালেই টাইপরাইটারে বসবেন অনুপম।—কাল খবরের কাগজের লেখাটা ফেরৎ এনেছেন। সেটা ফের লিখতে হবে। দাঁত মাজতে মাজতে এই সব ভাবছিলেন, হঠাৎ মনে হল, দেখি তো গলাটা আজ কেমন ?—'কেষ্ট'···ডাকতে গিয়ে একটা বিকৃত আওয়াজ বেরুলো—সঙ্গে সঙ্গে চড়াৎ করে মনে পড়ে গেল, আটটার সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ! এখনই আটটা বাজে। আজ ডায়ারিটাই দেখা হয় নি সকালে উঠে। আশ্চর্য !

ডাক্তার তখনও ছিলেন। অনুপমের জিব টেনে ধরে গলায় উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে শুনে বললেন— কিছুই তেমন না, কোনও ইনফেকশন দেখতে পাচ্ছেন না, সর্দিও হয়নি— বোধ হয় টেনশন থেকে গলা ধরেছে। কাজের চাপ থাকলে অনেক সময়ে ধরে যায় এরকম। ঘুমটুম ভাল হচ্ছে ? নিয়মিত বিশ্রাম আর গার্গলটা

করলেই সেরে যাবে। প্যাডের কাগজে লিখে দিলেন একটা ওষুধের নাম। একটা স্নায়ুস্নিগ্ধকর বটিকা।

অনুপম অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন বেরিয়ে এসে ভাবলেন প্রথমে কোথায় যাবেন। কমলকলি ফোন করেছিল, একবার খবর নেবেন? স্নায়ুস্নিগ্ধকর বটিকার প্রেসক্রিপশনটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ওসবে তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁর মন, বুদ্ধি, আবেগ ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে, তাঁকে ওষুধের ওপর নির্ভর করতে হবে না। যার মনের ওপর এটুকু সংযম নেই, সে মানুষ অমানুষ।

কমলকলির বাড়ির সামনে গাড়িটা যেন আপনিই এসে থামলো। নেমে রিং করলেন। উর্দিপরা গাড়োয়ালী বেয়ারা সেলাম করে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো। গয়নার বাক্সোর মতো বন্ধছন্দ ঠাণ্ডা হিমঘর। তবুও পাখাটা খুলে দিয়ে গেলো। অনুপম সদ্য গদির গভীরে ডুবে যাচ্ছেন, এমন সময়ে কোথা থেকে কমলকলির ক্ষুদ্র পিকিনিজ কুকুর আবির্ভূত হয়ে আচমকা অনুপমের পদতলে গড়াগড়ি দিয়ে দিলো। চমকে উঠে, অন্যমনেই তাকে একটি মৃদু পদাঘাত করে ফেললেন অনুপম রায়। রিফ্লেক্স এ্যাকশনে। কুক্কুরের জীবটি কিন্তু সুবিধের নয়, তীক্ষ্ণ করুণ, প্রলম্বিত অভিযোগে বাড়ি মাথায় করলে। সাধে আর পোষা জীবজন্তু পছন্দ করেন না অনুপম!

তা বলে লাথি মারাটাও কাজের কথা নয়। রাগও জান্তব, ঘৃণাও প্রাকৃতিক বেগ। সভ্যতার প্রধান অস্ত্র সংযম। এবং বর্মও। হেন বিরুদ্ধতা নেই যাকে সংযমের সাহায্যে জয় করা যায় না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অনুপমের মনে হলো— উনি কেন কেবল অস্ত্রশস্ত্র, জয় পরাজয়, আক্রমণ, আত্মরক্ষা, এই সবই ভাবছেন। সভ্যতা মানে কি সংগ্রাম? যুদ্ধ-বিগ্রহ? না, সভ্যতা মানে শান্তি?

তা বৈকি। অনুপম ভাবলেন। 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট'

মানেই তো যুদ্ধ। যার সংযম নেই সে ফিট নয়, পূর্ণ মানবত্ব সে অর্জন করেনি।

কিন্তু ওই কুকুরটাকে। হঠাৎ। কেন ? স্বয়ংক্রিয় হয়ে ! তাঁর পা। ওই ক্ষুদ্র জীবটাকে। অকারণে। কেন ?

কী হয়েছে তাঁর কাল থেকে ? হাত থেকে কি ফস্‌কে যাচ্ছে কিছু ?

কফি টেবিলের ঝকঝকে কালো কাচের ওপর থেকে সাবধানে রেনেসাঁস আর্টের ভারী এ্যালবামটা তুলে নেন। প্রথমেই চোখে পড়ে তরুণ সেইন্ট সেবাস্টিয়নের তীরে তীরে ছাওয়া শরীর—শরবিদ্ধ সন্তমূর্তি॥

আচ্ছা, কাল রাত্রে···সমীর কোথায়—?

ভিজে চুলে ভিজে গায়ে কোনোরকমে বাথগাউনটা জড়িয়ে স্নান থেকে ছুটে এসেছে কমলকলি—'কী ডার্লিং, কী হয়েছে বেবি, কান্না কিসের ?'

ডার্লিং তখন কান্না থামিয়ে ঘরময় হিমশীতল শত্রুতা শুঁকে বেড়াচ্ছিলেন, ঝাঁপিয়ে এসে বেঁটে পা দুখানি সদ্যস্নাতা মেমসাহেবের জানুযুগলে তুলে, অধীর আকুলতায় ফেটে পড়লেন। দু হাতে ডার্লিংকে কোলে নিয়ে তার সদাশীতল, ভাঙা লাট্টুর মতো নাকটিকে একটি সশব্দ চুম্বন দান করে কমলকলি। সেই শব্দ সহসা, অতর্কিতে অনুপমের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রীতে টান্ দিয়ে টংকার তোলে, সেই টংকারের সূক্ষ্ম অনুরণন ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর স্নায়ুমূল বেয়ে, সর্বত্র।

চুম্বনটি অপব্যয় করেই কলি, অকপটে, পরম বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে পড়েঃ 'এ কী আপনি ! কী সৌভাগ্য ! রাম সিং তো কিছু বলেনি ? আমি শাওয়ারে ছিলাম। রাম সিং—কী আশ্চর্য কথা ! রাম সিং—'

গা থেকে বিদেশী সাবানের মূল্যবান সৌরভ, চুল থেকে বিন্দু বিন্দু সুরভিত জল টুপ্‌টাপ্‌ কাশ্মীরে তৈরি গালচের ওপরে, প্রসাধন-হীন মুখের চারপাশে ভিজে চুল লেপ্টে ছবি, গালে, কপালে, চোখের পাতায় অভ্রের কুচির মতো জলকণা, অপ্রস্তুত কমলকলিকে কিশোরীর মতো নিষ্পাপ আর অরক্ষিত দেখাচ্ছে। হাল্কা নীল রং পুরু তোয়ালের তৈরি বাথ-গাউনের নিচে ফর্সা দুটো পা ঘরোয়া চটিতে গলানো, চটির ডগা দিয়ে ছোট্টো ছোট্টো রূপোলি রত্নের মতো দামী নখের মালা ফুটে আছে।

কলি বললো, 'হোঅট আ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ!'

ওই নীল বসনের নিচে এখন কোনো বর্ম চর্ম নেই। আছে শুধু আবরণহীন কলি।

অনুপমের ঘোর ইচ্ছে করলো ওপরের ঢাকনিটুকু সরিয়ে দিয়ে বিদেশী সাবানের গন্ধটা সবগুলি ইন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়ে নিজের মধ্যে সবলে টেনে নেন। সহসা যন্ত্রচালিতবৎ উঠে দাঁড়িয়ে কমলের দিকে প্রার্থী দুই বাহু অধীর বাড়িয়ে দিলেন তিনি। কমলকলির দুই চোখের দর্পণে বিস্ময় উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই চকিতে স্থান এবং কালের জ্ঞান ফিরে এলো অনুপম রায়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেয়ারাটিও কলির ডাক শুনে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

এক গাল হেসে, প্রসারিত বাহু নিয়েই দৃঢ় পায়ে কলির দিকে এগিয়ে গেলেন অনুপম।

—'দাও, তোমার ডার্লিংকে আমার কোলে দাও তো, যা খুদে জীব, ওকে তো প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলাম আজ।'

নির্ভার হাসিতে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কলির বিভ্রান্ত চোখ। বিশেষ স্বস্তির সঙ্গে ডার্লিং-কে কোলে তুলে দিতে দিতে কমলকলি বলে:

—'ও, তাই বুঝি কান্না ? দুষ্টু মেয়ে ? কেবল পায়ে পায়ে ঘোরার স্বভাব হয়েছে !' .

তারপর, বেয়ারার দিকে চেয়ে দেখে, অনুপমকে : 'আপনি কি খাবেন বলুন ? আমি ততোক্ষণে চেঞ্জ করে আসি। কোল্ড কফি ? কোণা কফি ? হট্ চকোলেট ? কোক ? নাকি, একটু ঠাণ্ডা বীয়র দেবে ? কোনটা ভালো ?'

—'ভালো ?'—অনুপম রায় সেই হাসিটা হেসে ফেলেন, যেটা শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবাইকেই পলকে হত্যা করে থাকে।

—'ভালো তো বীয়রই সবচেয়ে, কিন্তু এই সকালবেলাতে বীয়র খাবো না। কফিই দাও। ব্ল্যাক।'

এটুকু কথা বলতেও তাঁর গলায় অল্প স্বল্প লাগছে। ডার্লিংকে মাটিতে ছেড়ে দিতেই সে খুরখুরিয়ে তার মনিবাণীর আশেপাশে চলে গেলো।

—'আসছি এক্ষুনি। রাম সিং, কোণা কফি করো, ব্ল্যাক। আর আমাকে একটা কোক।···আপনার গলায় আজ কী হয়েছে ? ঈশ্··· কেমন শোনাচ্ছে···'

রেনেসাঁস আর্টের বইটা টেবিলে খোলা পড়ে আছে। ভারী পাতাগুলো ফ্যানের বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে।

কুকুর, বেয়ারা, মেমসাহেব—এখন সকলেই বিগত। শূন্য ঘরে হিমযন্ত্রের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

বইটার দিকেই আবার অস্থির হাত বাড়ালেন।

এবারে খুলে যায় দা ভিঞ্চির লা-বেল্ ফেরোনিয়ের। লম্বার্ডির সেই টায়রাপরা যুবতী। এই মেয়েটির টেপা ঠোঁটের মধ্যে কোমলতার সঙ্গে একটা জেদ মেশানো—স্পষ্ট, সোজা চাহনির মধ্যে চাপা দর্প। আশ্চর্য। এই জেদী ঠোঁট, এই দর্পিত ঋজু চাউনি ওঁর

খুব চেনা চেনা। অন্য কোনো ছবিতে দেখা মুখের আদল? দা ভিঞ্চির তো অনেক ছবিতেই এক মডেলের আদল থাকে। কোন্‌ ছবিতে? কোন্‌টায়? মনে পড়ছে না। যে অস্থিরমতি হয়ে আছেন দু দিন ধরে অনুপম, মনে পড়বে কি করে, একাগ্রতা কৈ! কোন্‌ ছবির মতো মুখ এই মেয়ের? মনে পড়ছে না।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত মুহূর্তগুলি বয়ে যাচ্ছে, সঙ্গহীন। প্রতীক্ষায়।

না কফি, না কলি, কেউই প্রস্তুত হয়নি। কিসের প্রতীক্ষা তাঁর?

অনুপমের হঠাৎ মনে হোলো, কেন এসেছেন তিনি এখানে? কী চান তিনি কমলকলির কাছে? নিঃসন্তান কমলকলির অপর্যাপ্ত সময় এবং সমগ্র আহ্লাদ কেবলমাত্র সমাজের মই বাওয়াতেই ফলন্ত। এই নিঃস্ব নারীটির কাছে অনুপমের কিসের আশা? কেন আজ তিনি এখানে? এভাবে? কী চান তিনি?

কুকুর কোলে ঘরে ঢুকলো সুসজ্জিতা সুবাসিতা কমলকলি। ঘরের শোভা মুহূর্তেই বৃদ্ধি পায়। যেন এক গুচ্ছ টাটকা ফুল এইমাত্র সাজানো হলো সেন্টার টেবিলে। তাজা কফি থেকে সুরভি, সুরুচি এবং বাষ্প ছড়িয়ে, রাম সিংও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

অনুপম কী চেয়েছিলেন এখানে?

কিঞ্চিৎ উষ্ণতা?

কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতা?

কোন্‌ তাৎক্ষণিকতার প্রার্থী হয়ে তুমি এখানে এসেছো, অনুপম? এই সীমিত বাতানুকূলতায়?

কমলের ওখানে বেশিক্ষণ বসলেন না, কফি শেষ করে উঠে পড়লেন। প্রথমত, কুকুরের প্রতি আদরের আতিশয্য তাঁর স্নায়ুকে

পীড়িত করছিলো, দ্বিতীয়ত, গলা দিয়ে শব্দ বের করা যে এমন শ্রম-সাধ্য কর্ম তা কে জানতো ?

আজ কথা জমছিলো না। স্পর্শও না। গলাটা ভালো নেই।

শুধু কি গলাটাই ভালো নেই ?

বাড়ি ফিরে এসে নিজের পরমাশ্রয়ে গিয়ে বসলেন—টেবিলে। টাইপ-রাইটারের ঘোমটা তুলে। মেশিনে কাগজ বসাতে গিয়ে কাগজ-পত্র তলা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

একটি না-খোলা বাদামী খাম। মা কাল হাতে এনে দিয়েছিলেন, মেঝে থেকে কুড়িয়ে। সুধার চিঠিটা। এবং বিদ্যুৎ চমকের মতো স্মৃতির সূত্রগুলিতে যোগাযোগ ঘটে গেলো— লা বেল্ ফেরোনিয়ের-এর সেই চাপা হাসি, সেই জেদী, দর্পিত চোখ—কার মতো। কেন অতো চেনা।

চিঠিটা খুলতে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল করতল। এবং তারপরে না খুলেই খামটি ভরে রাখলেন দেরাজে।

এবার শুরু হোলো টাইপরাইটারের বিচিত্র বাজনা, নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ অক্ষরমালার যন্ত্রসঙ্গীত।

॥ ৯ ॥

মা এসে বসেছিলেন ঘরের এককোণে, মার প্রিয় আরাম কেদারায়। পিছনে না তাকিয়েই অনুপম দিব্যি টের পাচ্ছেন পিঠের ওপরে একজোড়া শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। মা কথা কন কম। ছেলের কাজে ব্যাঘাত হয় পাছে, তাই এখানে এলে আরো কম। চুপচাপ বসে থাকেন, হয়ত একটা সেলাই বোনা কিংবা একটা বাংলা বই নিয়ে—কখনো বা হাত থাকে আঁচলের তলায়, জপের মালায় গাঁথা। দুটো-একটা কথা হয়তো বলেন—'অনু, তোর পায়ের নোখগুলো কদ্দিন

কাটিসনি রে?' অথবা—'এ ঘরটাতে একবার ঝুল ঝাড়াতে হবে।'—কদাচ ভৃত্য সমস্যা, পড়শী বৃত্তান্ত ইত্যাদি ফাঁদেন না মা। মা চুপ করেই বসে আছেন পিছনে। দেখছেন ছেলের কাজ করা। আপাতত অনুপম চেষ্টা করছেন, 'রয়জ কর্ণারে'র এই কিস্তির লেখাটা ঘষামাজা করতে। এক সময়ে বললেন—'কিছু বলবে, মা?'

—'তোর গলার কথাটা। গলা তো ভালো শোনাচ্ছে না বাবা? সকালে ডাক্তারবাবুকে পেলি? কী বললেন? কী হয়েছে?'

—'কিছুই হয়নি বললেন। কাজের চাপে ঘুমটুম ভালো হয়নি, তাই। ও কিছু না। সেরে যাবে।'

—'ওষুধ বিষুধ?'

—'দেননি।'

—'যাক। ভগবান! মধুসূদন! রাধামাধব!'

টকাটক টকাটক লাফিয়ে উঠতে লাগলো ফণাতোলা অক্ষরগুলো, কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে ফেলতে লাগলেন। কেষ্ট খাবার দিয়ে ডাকতে এল, ফিরে গেল তিনবার—মা এসে পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়ালেন একবার, দুবার—রেডিওতে ডিক্টেশন স্পীডে খবর বলা কখন শেষ হয়ে গেছে—কেষ্ট এবার বলল—'দাদাবাবু। আমি কি তাহলে খেয়ে নেব?'—হচ্ছে না। হচ্ছে না, হচ্ছে না, কিছুতেই হতে চাইছে না লেখাটা। জমছে না। নাঃ, কিছুতেই সুস্থভাবে জন্ম নিচ্ছে না এ সংখ্যার 'রয়জ কর্ণার'। জেদ চেপে গেছে অনুপমের।—হচ্ছে না। 'কনস্ট্রাকটিভ্ ক্রিটিসিজম্'টা কিছুতেই বেরুচ্ছে না কলম দিয়ে—অথচ, 'আপনারাই তো দেশকে পথ দেখাবেন, গাইড লাইনস দিয়ে দেশের লোকের রি-অ্যাকশনস্ ফর্ম করাবেন?' এক গ্লাস বীয়র নিয়ে বসতে পারলে ভালো হতো। আরো ভালো, একটা হুইস্কি।—কিন্তু, না। মা আছেন। চললো যুদ্ধ। সদর্থক সমালোচনার জন্য যুদ্ধ।

মা এবার এসে দাঁড়ালেন চেয়ারের পিঠে হাত রেখে। '—তিনটে বাজে অনু, থাকুক পড়ে তোমার লেখা। তুমি বরং এবারে খেয়ে উঠে একটু শুয়ে নাও না? ডাক্তার বলেছিল বিশ্রাম নিতে—আমিও তো বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ টাঙিয়ে রাখবি বাবা?'—

চমকে উঠলেন অনুপম। এ কী হয়েছে তাঁর? পদে পদেই কী যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সকালে লেট হয়েছেন ডাক্তারের এ্যাপয়েন্টমেন্টে। কমলকলির বাড়ীতে কুকুরটাকে হঠাৎ—তারপরে আরো বিশ্রী, ওভাবে হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে দিয়ে—ছি ছি ছি! - অবশ্য কমলকলি বুঝতে পারেনি, কিন্তু অনুপমের তো বুঝতে বাকি থাকেনি তার প্রার্থনা কী ছিল এবং কোথা থেকে সেই চাওয়ার উৎপত্তি।—এখন আরেকবার। মা যে বসে থাকেন, মা যে অনুর খাওয়া না হলে খেতে বসেন না, তা তো তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই মা এলে কখনোই দেরি করেন না। কি দিনে, কি রাতে, খাবার সময়ে বাঁধা নিয়মে ফিরে আসেন বাড়িতে। আর আজ? বাড়িতে বসে বসেই তিনি ভুলে গেলেন, মার খাওয়া হয়নি, মা বসে রয়েছেন!—ভুরু কুঁচকে উঠেছে—মুখে নিজের প্রতি রাজ্যের বিরক্তি, অনুপম উঠে দাঁড়ালেন। পাতে ভাত দিতে দিতে মা বললেন—'রাগ করিস না বাবা, এখনও না খেলে তোর শরীর টিঁকবে কেন—আমার আজ আসলে একাদশী'—

অনুপম একবার মুখ তুলে মায়ের দিকে চাইলেন। উপবাস-ক্লান্তির ছায়া মাখা রোগা মুখে কিশোরীর দুষ্টু হাসির লজ্জা।

মা চুপ করে মোড়ায় বসে ছেলের খাওয়া দেখেন, বেশি কথা বলা তাঁর ধাতে নেই।—'তুই বিয়ে না করলে আমি মরেও শান্তি পাব না' —এই বাক্যটা কেবল মাঝে মাঝে বিশেষ করে অনুপম খেতে বসলেই মা আগে আগে বলতেন। অনুপমের ছোট মাসী যখন ডানলপের অরবিন্দ ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রস্থান করলেন, ডিভোর্সের মামলা চলবার

সময়ে ছোটো মামা হঠাৎ একগাদা সোনেরিল খেয়ে মামলার রায় দিয়ে দিলেন। সেই ব্যাপারটার পর থেকে অনুপমের ছুটি হয়েছে, মা আর বিয়ে করতে পীড়াপীড়ি করেন না।

বিচিত্র নবীন বিশ্ব এসে মা'র দর্জিপাড়ার ঘোর বৈষ্ণব বাড়ির ভিৎ নড়িয়ে দিতে স্বুরু করেছে। স্বল্পভাষিণী মা তাই আরো স্বল্পবাক্ হয়ে যাচ্ছেন। 'প্রতুল' শব্দটি, অনুপমের ছোটো মামার নাম, আর কোনোদিন তাঁর মুখে শোনা যায়নি।

মা, তোমার কপালে অনেক দুঃখু লেখা ছিল, জীবনের প্রথম থেকেই। ভাঙ্গা গলায় অনুপম কথা বলার চেষ্টা করেন—'বিষ্ণুপ্রিয়ার চিঠি এসেছে?'

—'এসেছিল তো গেল সোমবার। মেয়ের ছবি পাঠিয়েছে।' অনুপম মার দিকে চাইলেন। মা নতমুখে বসে আছেন, একটু যেন অন্যমনস্ক। মাগো, তোমার যুগ ফুরিয়েছে। দর্জিপাড়ার রায় বাড়ীর ছোট মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এখন প্রিয়া অপেনহাইমার হয়ে টেকসাসে একটা কলেজে 'ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশন'এর কোর্স পড়ায়। প্রতি সপ্তাহে রঙিন কার্ড পাঠায়। নীলনয়না মেয়ের ছবি পাঠায়। মেয়ের নাম রেখেছে, বেলারাণী। অনুপমের মায়ের নাম। জামাই বলেছে, ওদের দেশে নাকি আদর করে ঠাকুমা-দিদিমার নামে নাম রাখা নিয়ম। জ্যেঠাইমার নাম ক্ষেমদাসুন্দরী, ওটা চলবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই খুড়িমার নামে নাম রেখেছে—'বেলা।'

মা আড়ষ্ট হয়ে কল্পনায় ভাবতেন জামাই-মেয়ে মিলে সারাদিন তাঁর নাম ধরে খুব সহজভাবে ডাকাডাকি করছে,—'বেলা! বেলা!' —ভেতরের অস্বস্তিটা বুঝি একদিন ছলছল চোখে নিরুর বউ বীথির কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন—শুনে বীথি হেসে বাঁচেনি! জগতে কি কেউ কাউকে বোঝে না? কেউ কারুর দুঃখের গোড়া মাপতে পারে না—কেউ কারুর সুখের গোড়াও ছুঁতে পারে না। এই তো

তুমি বসে রয়েছো আমার সামনে, নিয়মমাফিক সন্তানের খাওয়ায় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছো, আমার প্রকৃত পুষ্টির দিকে কি কোনোদিনও তুমি নজর দিয়েছিলে, মা? আমার একটা শরীর আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা ছাড়াও যে একটা আমি আছি, তার পুষ্টির কথা, তার স্বাস্থ্যের কথা কখনো তুমি ভেবেছিলে মা? তোমরা মেয়েরা কেবল বাইরে-টাকেই যত্ন করতে শিখেছ। বাইরেটা নিয়েই আছ।—মাংস-ডিম না খেলেই কি অহিংসা হয়? জ্যেঠাইমা তো মাছও খান না। জ্যেঠাইমার জিহ্বাগ্রে যে এ্যাটম বোমা আছে, তাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমার ছেলেবেলা। কিন্তু তোমার তো কিছুই হয়নি। তোমার ভেতরটা কী দিয়ে তৈরী মা? অথচ ভাসুর-ঝি-জামাই নাম ধরে ডাকছে কল্পনা করেই তোমার চোখে জল আসে। কোন্ বিচিত্র ধাতুতে তৈরি তোমার অন্তরাত্মা?

—'মাছ আরেকটা দিক তোকে?'

—'না মা, এত অবেলায়'...(আর খাওয়া উচিত নয়।)

—'তোর গলাটা একটুও কমেনি। থাক, কথা বলিস না।... কালকে কি তোর লেকচার আছে?'

—'আছে মা।'...(কী করব তাই ভাবছি।)

—'দিস না লেকচার। বিশ্রাম দে গলাটাকে।.. ছুটি নেয়া যায় না?'

—'তা যায়।' (ছুটি কি এখনই নেওয়ার দরকার আছে?)

—'তাই নে বাবা। আর গলাটা বরং গঙ্গার ডাক্তারকে দেখা।'

—'দেখি, আর ক'টা দিন দেখি?'

—'কী বললি? কিছু বুঝতে পারলাম না।'

—'বলছি, আর কটা দিন দেখি।'

—'থাক থাক—কষ্ট করে কথা বলতে হবে না বাবা, গলাটা বড্ডই খারাপ হয়েছে।'

১০

খেয়ে উঠে পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, টাইপরাইটারের সামনে অনুপম। খেতে বসে লক্ষ্য করেছেন গলাটা আরো খারাপ হয়েছে। এটা খাব, ওটা খাব না বলতেও কষ্ট হচ্ছে, ক্লান্তি আসছে, অর্ধেক বাক্য বলে বাকী বক্তব্যটা মনে মনেই সারতে হচ্ছে। টাইপ করতে করতে ঠিক করে ফেললেন এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে নিতে হবে, ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে যাওয়া দরকার। মনে হয় এটা 'ই-এন-টি'-এরই ব্যাপার। ও সব নার্ভ-টার্ভ নয়। আজকাল ডাক্তাররা রোগ নিরূপণের কষ্ট কমাতে বলে দেন, নার্ভের ব্যাপার, নয় এ্যালার্জি। তা নাহলে আরেকটা আছে, খুব কাজে লেগে যায়, 'সাইকো সোমাটিক'। এই গলা বসে যাওয়াটাকে ওরা তিনটের কোনো একটা বলতে পারেন। অথবা ঠাণ্ডা-গরমের ব্যাপার। কিংবা ভাইরাস ইনফেকশন। মনে মনে হেসে নেন অনুপম। ক্যাটাগরাইজ করে ফেলা যায় সব কিছুই। কিন্তু গলার ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে, তবু একবার। একটা চিকিৎসা দরকার। এভাবে চলে না। স্বর ফেরৎ চাই।

ময়লা কাগজের ঝুড়ি উপচে পড়লো বানচাল হওয়া কাগজে। আপ্রাণ যুদ্ধ চলে টাইপরাইটারের সঙ্গে। কয়েকটা ফোন এলো। দর্শনার্থীরাও এলেন বার কয়েক, ভিন্ন ভিন্ন কাজে। কিন্তু খুব বেশি সময় নষ্ট হয়নি। অনুপমের সময় অন্য লোকে নষ্ট করে দিতে পারে না। ইচ্ছেমত ফোন রেখে দিতে পারেন অনুপম। অন্যপক্ষকে বেশিক্ষণ বাজে বকবক করবার সুযোগ না দিয়ে, একটা অমোঘ অন্তিম সবিনয় স্বরে 'আ-চ্ছাঃ' বলে আলোচনা শেষ করে দেন, একটুও

রূঢ় না হয়ে। প্রত্যাখানের শিল্পে অনুপমের বরাবরই অসামান্য দক্ষতা। কারুর মনে আঘাত না দিয়ে, নিজেকে অসুন্দর বা অপ্রিয় না করে কীভাবে মানুষজনকে বিনীতভাবে বিমুখ করতে হয়, অনুপম অল্প বয়েস থেকেই তা রপ্ত করে ফেলেছেন। তা বলে অনুপম যে প্রত্যাখ্যান করতে ভালোবাসেন তা নয়। বরং অনুপম প্রার্থনা পূর্ণ করতেই ভালবাসেন।

রিং বাজলো, কেষ্ট দোর খুলে দিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো।

—'দাদাবাবু?'

—.........

—'দুজন ভদ্রমহিলা এসেছেন।'

চেয়ার ঠেলে, টাইপিং বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম।

দুজন ভদ্রমহিলা সোফায় বসে 'ফ্রন্টিয়ারের' পাতা উলটোচ্ছেন।

—'নমস্কার!'

—'নমস্কার! আমরা আসছি অল বেঙ্গল উইমেন্স লীগ থেকে। লেডি রমোলা মিত্র আমাদের পাঠিয়েছেন।'

যতোই কাজে ব্যস্ত থাকুন না কেন, লোকজনকে সদাই সহাস্যে স্বাগত জানান অনুপম। কেননা তিনি জানেন অভ্যাগতের হাত থেকে কিভাবে অব্যাহতি নিতে হয়। সবিনয়ে, সৌন্দর্যের সঙ্গে তিনি নিজের কাজের সময়টুকু ছিনিয়ে নিতে জানেন।

অতিথিদের তোলবার জন্য তাঁর কয়েকটি পদ্ধতি আছে। কাজ মিটে গেলেই তিনি চরমভাবাপন্ন। নিশ্চিত বিদায়চিহ্নিত 'আ-চ্ছাঃ' বলে হেসে উঠে দাঁড়ান। এটি বেশ বিনীতও। গল্প করতে এসে না থামলে প্রথমে হাই, তারপর ক্রমশঃ অন্যমনস্কতা, তারপর শুনতে না পাওয়া এবং তারপরে জবাব না দেওয়া। তাতেও না হলে সেই

অন্তিম 'আ-চ্ছা:' তো আছেই! এগুলো তাঁর আত্মরক্ষার উপায়।

ব্যর্থমনোরথ উইমেন্স লীগের পরে ফিরে গেল সেণ্ট জেভিয়র্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের ছেলেরা। সঞ্জীব লেখাটা আজই নিতে আসতে চাইছিলো—কিন্তু কাল বিকেল পর্যন্ত সময় নিয়েছেন অনুপম। কী যে হয়েছে! কিছুতেই দাঁড়াচ্ছে না লেখাটা। কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম যে এতো দুঃসাধ্য কঠিন কর্ম, কে জানতো? নীলাব্জও ফোন করেছিলো। সৌগত চৌধুরীর বাড়িতে যে পার্টিটা আছে আজ, তার এক ঘণ্টা আগে ওখানেই একটা মিটিং ডেকেছে, পত্রিকা বিষয়ে। অর্থাৎ আবার ললিত, আবার সতী, আবার বিতর্ক—কথা বলার কথা ভাবতেই ভালো লাগছে না অনুপমের। না, পার্টিতেও যাবেন না অনুপম। লেখা এখন দুটোই শেষ করা জরুরি।

—'কেষ্ট, এক কাপ কফি।'

মা এসে দাঁড়ালেন। হাতে কালো কফির পেয়ালা।

—'কেষ্টকে একটু বাজারে পাঠিয়েছি অনু।'

—'তা'বলে তুমি নিজে কেন মা মিছি-মিছি।'

—'তাতে কি হয়েছে বাবা? আমরা বুঝি গরম জলে কফির গুঁড়ো গুলতে জানিনে?'

—'সেজন্য নয়।'—চুমুক দিতে দিতে অনুপম বললেন—'কফিটা খুবই ভালো হয়েছে।'

শুনে মা প্রসন্ন হাসেন। তারপরই বলেন:

—'কিন্তু তোমার গলাটার জন্যে মন ভালো লাগছে না অনু। তুমি কালই গলার ডাক্তারকে দেখিয়ে ফ্যালো বাবা।'

—'দেখি। চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই। তুমি ভেবো না মা।'

চেষ্টা করতে করতে অনুপমের মনে হচ্ছিল সুনাম থাকাটা একটা অভিশাপ। সুনামের দুর্ভাগ্য এই, যে সেটা রক্ষা করবার একটা দায় থাকে। যশের চক্র অবিরাম ঘুরে যায়। সর্বক্ষণ যদি ওপরদিকে অটল থাকতে হয় তাহলে সর্বক্ষণ নিরলস পরিশ্রম করা দরকার। পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ নন অনুপম। কিন্তু এই লেখাটা দানা বাঁধছে না। বারবার পড়ছেন, যা ছিলো সেটাকেই দিব্যি ভালো মনে হচ্ছে ওঁর।

নেভিল ম্যাক্সওয়েলকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা বিষয়ক প্রসিদ্ধ বইটি ছাড়াও এখন বেস্ট সেলার তাঁর ভিয়েত-নাম বিষয়ক চটকদার বই 'দ্য টোয়েন্টিয়েথ ব্রুমেয়ার'। ফরাসী বিপ্লব বিষয়ে মার্ক্সয়ের মতামতের পটভূমিতে, মার্ক্স বেঁচে থাকলে এই ভিয়েতনাম যুদ্ধের কী ব্যাখ্যা দিতেন সেই নিয়ে একটি কাল্পনিক থিওরেটিকাল রচনা। বিদেশে পেপারব্যাক হয়ে গেছে, খুব পপুলার হয়েছে বইটা। তাঁর ষষ্ঠ বই ম্যাকার্থি পিরিয়ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির টিঁকে থাকার সটীক সানুপুঙ্খ ইতিহাস, একটি মূল্য-বান বামপন্থী পর্যালোচনা। এইটি বেরুবার পর থেকেই ইউ. এস. আই. এস. তাঁকে আরো প্রবলভাবে খাতির করা শুরু করেছে। তিনি অবশ্য বাম-দক্ষিণ কোনো কনসুলেটের মদের পার্টিতেই যান না। যদিও নিমন্ত্রণ পান সর্বঘটেই। মার্ক্সের দেড়শত বার্ষিকীতে যেমন হোলো। দু'পক্ষ থেকেই তা উদ্‌যাপিত হোল, অবশ্যই দুই ধরনে। অনুপম রায় কিন্তু দুই সভাতেই বক্তা ছিলেন। এতে তিনি দোষের কিছুই দেখেননি। তাঁর বিষয়, মার্ক্স ও আধুনিক বিশ্ববোধ। অথচ সুধা তা নিয়ে কথা শোনাতে ছাড়েনি। সুধা বড়োই কথা শোনাতো। বড়ো দুর্বিনীত মেয়ে সে। তাঁর কাছেই গবেষণা করলে কি হবে, স্বভাবে স্পর্ধার শেষ নেই। অতি দরিদ্র, উদ্বাস্তু মেয়ে। আজন্ম যুদ্ধ করে, একক প্রচেষ্টায়, অনেক বয়সে শেষ পর্যন্ত জীবনে দাঁড়াতে

পেরেছে। অথচ জীবনের ওপর এতটুকু লোভ নেই, ক্ষোভও নেই। অদ্ভুত একটা মানুষ এই সুধা মেয়েটা।

মাত্র একটিই দিন, সেটা ছিলো ডিপার্টমেণ্টের একটা মুনলাইট পিকনিক, কেবলমাত্র একটিবারই, এবং সেও এমন কিছুই নয়, অথচ তারই জন্য সুধার—সেই অতি তুচ্ছ ঘটনায়—

…যাক। সুধা সরে গিয়েছে, অনুপম যেন মনে-প্রাণে মুক্তি পেয়েছেন।

আধখানা খাবার পরে কফিটা জুড়িয়ে গিয়েছে। লেখা এগোচ্ছে না। স্বহস্তে একটা শাণিত লেখাকে কী করে ভোঁতা করবেন অনুপম? এ যেন লেখাটার মুণ্ডচ্ছেদ করার মতো দাঁড়াচ্ছে। সারাদিন ধস্তাধস্তি একটা সামান্য খবরের কাগজের কলম লেখা নিয়ে? এই তুচ্ছ ব্যাপারে এমন দোটানা—

[—দোটানা? শুধু দোটানা কেন, তেটানা, চৌটানা—আপনি তো কতরকম টানাটানিতেই কষ্ট পান—

অনুপমের বুকের মধ্যে যেন সুধার গলাটা নিঃশব্দে কথা কয়ে উঠলো।]

—'ছাখো সুধা, আমি ছোটবেলাতে ভাববার সুযোগ পাইনি বড়ো হয়ে কী হবো। কেউ কোনোদিন আমাকে প্রশ্ন করেনি, অনুপম, তুমি বড়ো হয়ে কী হবে? আমি তাই কখনো সিরিয়াসলি ভেবে দেখবার সুযোগ পাইনি, আমি, অনুপম রায়, কী হবো। তবে অনেক-গুলো জিনিস যে একত্রে হওয়া যাবে না, যেমন হীরু হাতির মাহুত এবং হীরু হাতি—কিংবা অনুপম রায় এবং রাইটার্সের বড়বাবু—এটুকু জানা ছিল। সুধা, আমি যা হয়েছি, তা আমি অনেক চেষ্টা না করেই হয়েছি। কিন্তু এখন আমি যা হচ্ছি, তা আমাকে খুব চেষ্টা করে হতে হচ্ছে।'

—'দাদাবাবু ? আলোটা জ্বালেননি ?'

হঠাৎ চমকে উঠলেন অনুপম রায়। কেষ্ট আলো জ্বেলে দিয়েছে।

—'আর কতোক্ষণ লিখবেন ? একটু ঘুরে আসুন না বাইরে। চা দিই ?'

কেষ্টর চোখে আজ বেয়নেট নেই, মলম আছে। মলমের জ্বালাই বেশি। অনুপমের স্বরে কাঠিন্য এসে পড়ে—'এখন উঠতে পারব না। লেখাটা জরুরি। কফি। ব্ল্যাক।'

ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে আটটা, টেলিফোন বাজলো পুনর্বার। যেন বেঁচে গেলেন অনুপম রায়। কমলকলি নিশ্চয়। একটু বেরুবেন এখন। আর পারা যাচ্ছে না। একটা সামান্য লেখা নিয়ে এতক্ষণ···

—'হ্যালো ? অনুপম ? সোমশংকর বলছি।'

—'······!'

—'থ্যাংকিউ ফর গিভিং আপ দ্য কিট ব্যাগ। জানেন, ওতে কী কী কাগজপত্তর ছিল ? তাছাড়া দুটো পাইপগান, কার্ট্রিজেস, আর একটি নোটবুক। অনেক সুবিধা হল আমাদের এই নোটবুকটা পেয়ে। আই থট ইয়ুড লাইক টু নো।'

—'কী হল ? হ্যালো ? হ্যালো ? হ্যালো ?'

—'হ্যাঁ, বলুন।'

—'টেলিফোনটা কি খারাপ হয়ে গেছে ?'

—'না তো।'

—'কান্ট হিয়ার !'

—'সমীর···'

—'কি বলছেন ?'

—'সমীর…'

—'সমীর? ওঃ, দ্যাট বয়? হি ইজ আণ্ডার এ্যারেস্ট নাউ। নোটবুকটা পাবার পরে ওকে ধরাটা এসেনশিয়ল হয়ে পড়লো ডিটেলসের জন্য।'

—'ও-হ্…'

—'নট টু ওয়ারি, নট টু ওয়ারি। হি উইল বি কেপ্ট এলাইভ।'

—'……।'

—'যাক্, থ্যাংক ইয়ু ফর এ্যাকটিং ইমীডিয়েটলি।'

—'শুড আই নট থ্যাংক ইয়ু?'

—'অফ কোর্স নট। এ তো বন্ধুকৃত্য মাত্র। আরে, আমি তো জানিই, দ্যাট হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ ইয়োর ঔন পলিটিক্স—দ্যাট ওয়াজ মিয়ার্লি এ্যান এ্যাক্ট অফ কাইণ্ডনেস অন ইয়োর পার্ট…অব্‌ভিয়াসলি …তাই নয় কি?'

—'… !'

—'আ—চ্ছাঃ?'

সোমশংকর দত্ত রায়ই ফোনটা আগে নামিয়ে রাখলেন। যে সবিনয় অন্তিম 'আ—চ্ছাঃ'টা বলা অনুপমেরই একচেটিয়া, আজ সেইটাই উচ্চারণ করলেন সোমশংকর।

—'মা…?' বিকৃত আওয়াজে আর্তনাদ করে উঠলেন অনুপম রায়।—'আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি খেয়ে নিও।'

টাইপরাইটার খোলা পড়ে রইলো কাগজ কার্বন বুকে নিয়ে। গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে নেমে গেলেন অনুপম। না। কমলকলি নয়। নীলাব্জদের পার্টিও নয়। প্রমীলা রোহদ্‌গীর সাত তলার ফ্ল্যাটে সাদার্ন এ্যাভিনিউতে। প্রমীলার ওখানে ভালো স্কচ থাকে।

যীশু বললেন—'কাক ডাকবার আগেই এই তুমিই আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে, পিটার।'

॥ ১১ ॥

পথে ইচ্ছে করলো লেক দিয়ে ঘুরে যেতে। লেকের মাঝখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে রাত্রিবেলায় বেশ লাগে।

মস্ত একখানা তামার পুষ্পপাত্রের মতো লালচে চাঁদ উঠেছে। দর্জিপাড়ার বাড়িতে ইয়া ইয়া পুজোর বাসন, পুষ্পপাত্রের ছড়াছড়ি। তারই একখানা নিয়ে এসে বৈঠকখানায় টেবিল করেছেন অনুপম। সেই তামার পুষ্পপাত্রে এখন রাখা থাকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি স্ফটিকের কচ্ছপ, তার খোলে জমা হয় দেশী-বিদেশী ছাই, দেশলাই কাঠির পোড়া শরীর, উচ্ছিষ্ট তামাকের টুকরো।

শন্‌শন্‌ শব্দে হাওয়া বইছে, চলন্ত গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে এসে গতির ঝাপটায় অনুপমকে বধির করে দিচ্ছে। ওই তামার থালাটি এবার মুঠো মুঠো কালো ফুলে ঢাকা পড়ে যাবে। অসুখী হয়ে উঠছে রাত্রির চিকন মুখ।

জ্যোৎস্না জলে ভরা হ্রদ দুটির মাঝখানে রাস্তাটা যেন আদিম নৌকো হয়ে ভাসছে। অনুপমের মনে হোলো, মিশরের প্রাচীন মৃৎপাত্রের গায়ে যেমন আঁকা থাকে, রাস্তার দুধারের বৃক্ষসারি যেন তেমনি সারবন্দী শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস, তাঁর নৌকোয় বৈঠা টানছে হেঁইও—হো, জোর বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস, তাঁর গাড়িটা যেন বজরার মধ্যে সিংহাসন—সব ব্যাপারটাই যেন একটা অতি চেনা পুরোনো স্মৃতি—যেন ঠিক এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে। কবে? কখন? অনেক, অনেক আগে কখনো কি? লেকের এতো কাছাকাছি বাস করেন, কিন্তু যখন-তখন লেকে এসে বসে থাকার অবকাশ অনুপমের জীবন থেকে মুছে গেছে। অথচ দর্জিপাড়ার রায়বাড়ির সেই ছেলেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়ে দু'নম্বর বাসে করে চলে আসতো প্রায়ই এই এতোটা দূরে। এই লেকের

জলের ধারে বসবার জন্যে। লালা, পঙ্কজ, সোমনাথের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বয়স তখন কতো? এই সমীর-বাদলদের মতোই···

লালা, পঙ্কজ, সোমনাথ। কোথায় এখন সেই ট্রায়ামভারেট? অনুপম সমেত ওরা ছিলো চারজন, ফোর মাস্কেটিয়ার্স।

উত্তর কলকাতার ছেলেদের পক্ষে এদিকটাই ছিলো নিরাপদ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবার সম্ভাবনা কম। শুধু তো ধূমপানই নয়, সোমনাথের আবার প্রেম-ট্রেম ছিলো কিনা। হ্যাঁ। তাও ছিলো। ওদের চারজনের মধ্যে একা সোমনাথের প্রেম ছিলো। মনীষা পড়তো ব্রাহ্ম গার্লসে, থাকতো শেয়ালদার কাছে, আর প্রেম করতো লেকে এসে। পঙ্কজ, অনু আর লালা তখন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে সিগারেট টানা প্র্যাকটিস করতো। কখনো বা কম্পিত আঙুলে লালার এনে দেওয়া ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সওদা কোণামোড়া চটি ইংরিজি মলাটহীন বই কোলের ওপরে খুলে বসতো তিন মাথা এক করে। সোমনাথের চেয়েও ধ্বক্-ধ্বক্ দ্রুত চলতো ওদের নাড়ির গতি তখন; হয়তো বা সোমনাথের চেয়েও টানটান হয়ে থাকতো ওদের ইন্দ্রিয়গুলি অপরাধবোধের তাড়নায়, অদৃশ্য গুরুজনদের কল্পিত পদশব্দে।

সোমনাথের পরীক্ষার পরেই সোমনাথ-মনীষা বম্বে পালাবে সব ঠিক করাই ছিলো। লালাদের গদি আছে বম্বেতে, লালা বলেছিলো ব্যবস্থা করে দেবে ওখানে একটা চাকরির। কিন্তু মনীষার বাবা তার আগেই ট্রান্সফার নিয়ে জোরজার করে পাটনা চলে গেলেন। সপরিবারে। সোমনাথ মনের দুঃখে ক'দিন দাড়ি রাখলো, সাইগলের রেকর্ড শুনলো, তারপরেই বি. এস-সি পরীক্ষা এসে পড়লো। ওদিকে পড়ার চাপটা পড়তেই এদিকে সব ঠিকঠাক হয়ে

গেলো। সোমনাথ, তোর মনীষার কথা মনে পড়ে? আমাদের চারজনেরই দাড়ি রাখা উচিত ছিলো। তোর প্রেমটা, আমাদের চারজনেরই প্রথম। রাজস্থানী ছেলে লালার অবশ্য বৌ ছিলো। ছেলেও ছিলো। কিন্তু প্রেম? সে অন্য ব্যাপার। টেক্সাসে কোথায় যেন চাকরি করছে সোমনাথ, মার্কিনী বৌ নিয়ে সুখৈশ্বর্যে আছে বলে শোনা যায়।—লালার সঙ্গে ইচ্ছে করলেই দেখা করা যেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছে করে না। সময়ই বা কোথায়? এখন সে নিয়মিত গদিতে বসে বড়বাজারে। আরো পাকা আমটির মতো দেখায় আজকাল লালাকে।

ম্যাট্রিক দেবার ঢের আগেই পুত্রের বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে দিয়েছিলেন লালার দূরদর্শী পিতৃদেব। ফলে, প্রেসিডেন্সির পোর্টিকোর নিচে গাড়ি থামলে, পাগড়ি-পরা ড্রাইভার যখন দরজা খুলে দিতো, একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেমে প্রথমে লালা ঢুকে আসতো প্রেসিডেন্সিতে, তারপরে লালার ছেলে বাবাকে 'টা-টা' করে মাঠ পেরিয়ে ছুটতো হিন্দু স্কুলে। গেল বছরে সেই ছেলের বিয়েতেই দেখা হোলো লালার সঙ্গে। কিন্তু পঙ্কজ সেদিন আসতে পারে নি।

সি এ. পাশ করে পঙ্কজ চাকরি করছে দুর্গাপুরে। কিছুদিন আগেই একটা মিটেঙে গিয়েছিলেন অনুপম রায়, তখন পঙ্কজ এসে দেখা করেছিলো। চুল পেকে গেছে, বুড়োমতন, রোগা, একটু কুঁজো, একটা ক্লান্ত মানুষ। যে নাকি এক সময়ে এক সঙ্গে টেনিস ব্লু আর ক্রিকেট ব্লু হয়েছিলো। ওর বউ প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই পক্ষাঘাতে অচল। শিশুটি আঁতুড়েই মারা গিয়েছে। জীবন্মৃত স্ত্রীর সেবা, আর অফিসের কাজ—এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে নিঃসন্তান পঙ্কজের ক্লান্তিকর দিন এবং রাত্রিগুলি। এতো বেশিক্ষণ ধরে, এতো ইনিয়ে বিনিয়ে তার অসুখী জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী ফেনাতে লাগলো পঙ্কজ,-যে বহুক্ষণ সমবেদনায় পর্যাপ্ত রকম গলতে থাকার পরে, অনুপম রায় শেষ পর্যন্ত

বাধ্য হয়েছিলেন সুস্পষ্টভাবে কব্জি উল্টে ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে। তারপর একবার মাত্র হাই তুলে তিনি নীরবে, সক্রিয় ও দর্শনীয়ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, এবার পঙ্কজ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো—'চলি অনু, তোরা কতো কাজের লোক, তোর দামী সময় বাজে খরচ করিয়ে দিলুম। আসলে কি জানিস, তোরা তো অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিস, আমরা সেইসব পুরোনো দিনের মধ্যেই আটকে রয়েছি। এই মফঃস্বলে আমাদের না আছে সময়ের জ্ঞান, না আছে সামঞ্জস্যের জ্ঞান। তুমি যে আমাকে চিনতে পেরেছিলে অনুপম, সেই তো যথেষ্ট। কুশল বিনিময়ের পরেও বসাটা আমার উচিত হয়নি। কি বলো?'

এতো স্মার্ট, ক্ষুরধার বাঙ্‌কুশলী অনুপম রায়কে নিরুত্তর রেখে খুব আস্তে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিলো, কুঁজোমতন বুড়োমতন রোগা লোকটা। আরো একটু কুঁজো, আরো একটু বুড়ো হয়ে।

অনুপমের হঠাৎ কেমন গরম বোধ হোলো। অথচ দিব্যি ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, ঝোড়ো-ঝোড়ো ধুলোটে গন্ধ বাতাসে। গাড়ি থামিয়ে অনুপম নেমে পড়লেন। বিশাল শাদা আকাশে এমন ফ্যাটফেটে জ্যোৎস্নায় গদগদ চাঁদপারা মুখখানা এখনো ভাসিয়ে রেখেছে পূর্ণিমা। অথচ আর একদিকে খেলতে শুরু করেছে কালো মেঘের ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ফর্সা কপালের চারদিকে চূর্ণকুন্তলের মতো উড়ছে এখনো —এক সময়ে ওই মেঘ সব আলো নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

কী বিপুলতা। কী অবকাশ। কতো নক্ষত্র। গ্রহতারায় পরিপূর্ণ অপার অখণ্ড নিখিল বিশ্বভুবন, এই অবিকার, অনিবার্য, অনতিক্রম্য, নিসর্গনির্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময়—চরাচরব্যাপী প্রবল চন্দ্রালোকে যেন সহসা অনুপমের শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইলো। তাঁকে ডুবিয়ে মারবার ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে আজকের পূর্ণচন্দ্র—পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাত্রে যতো ধরে তার সহস্রগুণ বেশি ঢেলে দিচ্ছে তরল পারার মতো ভারী,

ধাতুবৎ বিগলিত জ্যোৎস্না। অনেক কচি শিশু যেমন নিদ্রিত মাতার স্তনে চাপা পড়ে দম আটকে মরে—তেমনি এই নির্বিকার নিসর্গের চাপ থেকে নিস্তার পেতে, জলে ডোবা মানুষের মতো নাকটুকু শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে চেয়ে মুখখানাকে আবার সেই সীমাহীনতার দিকেই তুলে ধরলেন অনুপম—আবার সেই আকাশ। আবার সেই অসংখ্য নক্ষত্রের ডাকাডাকি। প্রত্যেকে এক একটি অনামা পৃথিবীর আলোক-সংকেত জানাচ্ছে, কোটি কোটি যোজন দূর থেকে সদর্পে ঘোষণা করছে স্বকীয় অস্তিত্ব, সেই অহংকৃত ভুবনের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

অনুপমের চোখ বাধ্য হয়ে মৃত্তিকায় ফিরলো। পায়ের নিচে নরম জ্যোৎস্না-ধবল তৃণরাজি। চকিতে কমলকলির বাহুমূলের স্পর্শ স্মরণে খেলে গেলো, চটি থেকে মুক্ত করে নিয়ে পায়ের নগ্ন পাতা দুটি নধর ঘাসে পাতলেন অনুপম রায়। ভিজে, রোমশ, স্যাঁতসেঁতে মাটি-ঘাস-মাটি। তিনি উষ্ণ পা রাখলেন। ঘাসমাটিতে কোনো রোমাঞ্চ উঠলো বলে তো মনে হলো না।

ও কি ? অনুপম দেখলেন বেঁটে বামনের এক বীভৎস মূর্তি চিৎ হয়ে ওই ঘাসে শুয়ে বুকে হেঁটে সরীসৃপের মতো নড়াচড়া করছে। বিকৃত, কৃষ্ণকায়, চ্যাপ্টা, বাঁটকুল এটি কে ? কোথা থেকে কখন এলো ? অনুপমেরই পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা রয়েছে তার গোড়ালি। হিঁচড়ে, টেনে, লাথি মেরেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না অনুপম। রক্ত ছলকে উঠলো, বুক বেয়ে উছলে পড়লো কানে, চোখে-মুখে। অনুপম ভালো করে চেয়ে দেখলেন ওই জমাট কদাকার অন্ধকার, ওই ঘাসে-গড়ানো বুক-পিছলে-হাঁটা ছায়ামূর্তির সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বন্দী।

তিনি আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে চাইলেন। হঠাৎ নিজেকে ছেলেবেলার মতো মেলার ভিড়ে পরিচয়হীন অতিথি বলে মনে হোলো,

অস্পষ্ট ভয়ে অস্থির হয়ে চারিদিকে আশ্রয়ের সন্ধান করলেন তিনি, গ্রহ গ্রহান্তরে পরিব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন পরিকীর্ণ সঙ্গতির মধ্যে শুধু তিনিই মূর্ত অসঙ্গতি। কী দৈন্য! কী তুচ্ছতা!

জোরে ঝড় উঠলো, অনুপমের মুখে অকস্মাৎ আছড়ে পড়লো কাঁকর-মেশানো ঝোড়ো বাতাসের শীতল প্রবল চাবুক। মুহূর্তে যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুপম দেখলেন আজ্ঞাবহ গাড়িটি বিশ্বস্ত গার্হস্থ্য প্রাণীর মতো পাশেই অপেক্ষা করছে। প্রভুর জন্য প্রস্তুত। প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকে পড়লেন তার গর্ভে। একটা আড়াল পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। অনুপমের মনে হোলো এই সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ছিলো, কিংবা পূর্বে ঘটে যাওয়া। যেন রাতের পরে রাত ধরে পুনরাবৃত্ত কোনও দুঃস্বপ্ন। যেন সবটাই রিহার্সাল দেওয়া ছিলো। এ ধরনের অনুভূতিকেই ফরাসিতে বলে deja-vu—দৃষ্টপূর্ব। বাংলাতে কী বলে? কিছুই বলে না। কিছুই বলে না? না না, আছে, এর একটা বাংলা নাম আছে। নামটি স্মরণে আসা মাত্র অনুপমের গায়ে কাঁটা দিলো। নাঃ, আর নয়। এবারে যেতে হবে। একটু রাশ টানা দরকার, অনুপম। যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছো অপ-বুদ্ধিকে আজ।

বাংলাতে এ রকম অনুভূতিকেই কি 'পূর্বজন্ম' বলে? বলে 'পূর্বজন্মের স্মৃতি?'

অনুপম রায় স্টার্ট দিলেন। ঝড় উঠলে কি হবে, জ্যোৎস্না নিবে গেলে কি হবে, লেকে তখনো যুগলবন্দীর ভিড়। হঠাৎ চমক লাগলো অনুপমের। উস্কো-খুস্কো চুলদাড়ি একটি ছেলের হাঁটার ধরনটা কি খুব চেনা? নাঃ। চোখের ভ্রান্তি। মেয়েটির কাঁধে বাহু জড়িয়ে সে ছেলে সুখী পায়ে ঝড়ের বিপরীতে হেঁটে যাচ্ছে। হতে পারে না।

'বাট্ হি উইল বি কেপ্ট এলাইভ'—সহজে মুক্তি হবে না তার। অনেক খবর চাই।

সহজে মুক্তি হবে না। অনুপম রায় উইল বি কেপ্ট এলাইভ।

অনুপম অনুভব করলেন, অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। লেক ফাঁকা হয়ে আসছে। আকাশে তাকিয়ে চাঁদটাকে খুঁজলেন। না, নেই। অথচ একটু আগেও দু'দুটো চাঁদ ছিলো, জলে একটা, আকাশে একটা। এখন একটিও নেই। নক্ষত্রগুলিও এক সঙ্গে নিবে গেছে। নক্ষত্রশূন্য নিষ্প্রভ রাত্রিকে ভয়ঙ্কর আলোড়িত করছে কিছু উন্মাদ বাতাস। পথ দেখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে এখন অনুপমের। ঝাপসা হয়ে এসেছে সব। রাস্তার আলোগুলোও কি জ্বলছে না? হঠাৎ খেয়াল হোলো উইণ্ড স্ক্রীন ওয়াইপর দুটি চালু করা আশু প্রয়োজন, বৃষ্টি এসে গিয়েছে। কোথায় যাবার জন্য বেরিয়েছিলেন?

কাচ যখন ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এলো, অনুপমের মনে পড়লো, প্রমীলার ফ্ল্যাটে শুধু স্কচই থাকে না, প্রমীলাও থাকে। বিলিতি ফার্মের বড়ো চাকুরে, স্বল্পবাসা, স্বল্পভাষা, কর্মতৎপরা, মুক্তপ্রাণা প্রমীলা রোহাদগী। না। প্রমীলার দামী পারফিউমড শস্তা শরীর, তার নীল 'স্বপ্নিল' শয়নকক্ষ, অনুপমের রুচিতে সহ্য হয় না। আজও হবে না।

তার চেয়ে সৌগতর ওখানে নীলাব্জরা নিশ্চয় এখনো আছে। মিটিংয়ের ঝামেলা চুকেবুকে গেছে, এখন পার্টি। ভালোই। পার্টিতে একা থাকা যায়। জনারণ্যই শহুরে বানপ্রস্থীর পক্ষে প্রকৃষ্টতম।

বানপ্রস্থ? আশ্চর্য! প্রমীলা রোহাদগীর বিকৃত ইচ্ছাকে অসহ্য লাগলেই যে বানপ্রস্থী হওয়া হোলো, তা কেন হবে। এখনও তাঁর গার্হস্থ্যই হোলো না। অন্তহীন ব্রহ্মচর্যে জ্বলে আছেন। নীলাব্জদের কাছে গেলে নিশ্চয় ভালো লাগবে। পুলক, নীলাব্জ, সৌগত, অম্বর। ওরা বন্ধু।

॥ ১২ ॥

ঘোর বর্ষণের পর অনুপম সৌগতর বাড়িতে পৌঁছুলেন। সেখানে তখন ঘোরতর আড্ডা জমেছে। সৌগত দামী তামাকের ফার্মে কাজ করেন। প্রায়ই বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের তাঁর আলিপুরের বাড়িতে ডেকে রাম-হুইস্কির অমৃতস্পর্শে তাঁদের বুদ্ধিতে শান দিয়ে দেন। নিজেও লিখতে ভালোবাসেন। কখনো সখনো 'ডেইলি নিউজে' ফীচার লেখেন। ইংরিজি সাহিত্য পড়েছিলেন এককালে অক্সফোর্ডে, তাই চাকরিটা যাই হোক না, নিজেকে বুদ্ধিজীবি মনে করবার মতো একটা তকমা তাঁর আছে।

সৌগতর একটি গোলগাল মাখনের মতো গিন্নি, আর ঠিক গিন্নির মতোই পরপর তিনটি সুগোল নবনীত কন্যা আছে। পার্টি যদিও বড়োদের, ঘড়িতে যদিও দশটা বেজে গেছে, এই ছোটো ছোটো চেরাবিক মুখলাবণ্যের মেয়েরা সেখানে যদৃচ্ছ বিহার করছে, হাতে বাদাম, আলু ভাজা ইত্যাদির পাত্র নিয়ে। সৌগতর এই গোল স্ত্রী ও গোল গোল মেয়েদের প্রতি অসীম দুর্বলতা। সৌগতর পত্নী অরুণিমার সঙ্গে অনুপম পাঁচ মিনিটও কথা বলতে পারেন না। যদিও বোঝেন প্রাণী হিসেবে অরুণিমা নিরীহ।

ঢোকা মাত্র সৌগতর গোল গোল মাখনের মতো তিনটে মেয়েই গড়গড়িয়ে বলের মতো তাঁর কাছে চলে এলো :

—'অনুপমকাকু, এতো লেট কেন, মা, বাবা, নীলাব্জকাকু, রাও কাকু, ওরা সব্-বাই কখন্ থেকে তোমাকে খুঁজছে!'

অনুপমের গা জ্বলে গেল। সকলেই 'কাকু', সকলেই 'তুমি', আর গুরুজনদের বিষয়ে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সময়ে শ্রদ্ধাবাচক —'ন' যোগ করা নেই! রায় বাড়ির ছেলেমেয়েরা এর চেয়ে ঢের সুশিক্ষিত— তারা ডাকতো 'কাকাবাবু', তারা বলতো 'আপনি', তারা বলতো

'বাবা মা খুঁজছেন'। এদের শেখা হচ্ছে যতো বঙ্গ-ইংরিজি ইসকুলের কদাচার।

অনুপম বলতে গেলেন—'একটা কাজে দেরি হয়ে গেলো'—কিন্তু গলা দিয়ে কেবল ঘড়ঘড় ছাড়া শব্দ বেরুলো না। তিনটে মেয়েই সমস্বরে কলকলিয়ে উঠলো—'আরে, তোমার গলায় কী হোলো? নিশ্চয়ই বিষ্টিতে ভিজেছিলে!'

ইতিমধ্যে সৌগত এসে দাঁড়িয়েছে—'হ্যাল্লোও! ইয়ু আর লেট!'

অনুপম বললেন—'ঘড় ঘড় ঘড়।'

—'ও কী হলো? গলায় আবার কী হলো?'

পাকা মেয়েরা কোরাসে চীৎকার করে ঘোষণা করলো:

—'হি হ্যাজ লস্ট হিজ ভয়েস!'

অমনি চারদিক থেকে অত্যুৎসাহী কলরব উঠলো: 'নুন গরম জল করে দিক, গার্গল……'

—'গার্গল? কার আবার গলায় ব্যথা?……'

—'গলায় ব্যথা? বেন্‌জয়েনের ভেপার নিলে··'

—'টনসিল বুঝি? পেনিসিলিন ইজ দি আন্‌সার···'

—'না বাবা, পেনিসিলিন অমন যাকে তাকে খেতে দিও না, জানো তো বেবির মাস্‌তুতো ভাইয়ের কী ট্র্যাজিডি হয়ে····'

—'এই তো সেদিন আমাদের অফিসের……'

অনুপম গিয়ে একটা সোফার আশ্রয় নিয়েছেন নীলাব্জর পাশে। নীলাব্জ, পুলক, ললিত, সতী, রমেন, শুভাশিস, মালবিকা, রুমা—সকলেই আছে। অম্বর নেই। অনুপমের চোখ আর এক পাক ঘুরে খুঁজে এলো—না। কমলকলি নেই। বিমল, কৃষ্ণমূর্তি, মোহনরাও আর ইউনুস একটা জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। চারজনেই গেলাশ হাতে প্রবল তর্ক জুড়েছে ব্রিটেনের কমন মার্কেটে ঢোকার প্রসঙ্গ

নিয়ে। ওকে দেখেই কৃষ্ণমূর্তি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তর্জনী নির্দেশ করে বললো—

—'হিয়ার ইজ আ ম্যান অফ মেচিওর পোলিটিক্যাল আনডার-স্ট্যাণ্ডিং, ওকেই জিজ্ঞেস করো সাধারণ মানুষের কাছে এটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে'—

ইউনুস চারমিনারের তামাকের টুকরো শব্দ করে জিবের ডগা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাস্যবদনে বললো—

—'আরে ধুর্, অগো জিগাইয়া লাভ নাই, জার্নালিস্টে জানেই বা কী, বুঝেই বা কী। তাদিগের যা কওনের তা প্যাপার-এই কইয়া ফেলায়। তাও হইত্য কথাডা কয় না।'

অনুপম জানেন, বাংলাদেশের মুক্তি বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত শেষতম বিশ্লেষণ ইউনুসের পছন্দ হয় নি। অনুপম মনে করেন বাংলাদেশে ঠিকমতো স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর না গেঁথেই উচ্চ ইমারৎ তোলা হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রচুর খেটেছে ইউনুস, সে তাঁর কথা মানবে কেন।

বিমল প্রসঙ্গ বদলাতে বললো—

—'তোমার গেলাশ ?'

অনুপম আশ্বাসের ভঙ্গিতে অভয় হস্ত উত্তোলন করেন, 'হবে, হবে।'

সৌগত এসে দাঁড়ায়—'রাম্ ? হুইস্কি ?'

—'ঘড় ঘড় ঘড়'।

—'রাম্ ?'

অনুপম মাথা হেলিয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করেন, যদিও তিনি রাম্ চান না। তবু, এই প্রশ্নোত্তরের একটা আশু সমাপ্তি দরকার।

ভুরু কুঁচকে নীলাব্জ বলে :

—'এত দেরি করলে যে ?'—অনুপম হাসলেন। তারপরেই

ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাতেই চোখো-চোখি হোলো রুমার সঙ্গে। চোখে চোখে হাসছে রুমা। ওর ঠোঁট সব সময়েই ভেজা, চিক্‌চিক্‌ করে, যেন এইমাত্র লেহন করা হয়েছে—বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না, সাপের গায়ের স্পর্শটা মনে পড়ে যায়।

রুমার হাসিতে কমলকলিকে মনে পড়লো আবার। সকালের স্নান জলে ধোওয়া ভেজা শরীরের কলি।

গোল গোল মেয়েগুলো বাদামের প্লেট নিয়ে এসে পড়েছে। প্রায় কোলের ওপরে এলিয়ে পড়ে একটা বললো :

—'কী নেবে কাকু ? কাজু ? চিপ্‌স ?'

ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আরেকটা বললো :

—'সসেজ ? ডালমুট ? বঁলো না, কী নেবে ?'

ওহ্‌! বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো কলির পিকিনিজ ডার্লিংয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পড়েন অনুপম রায়। মায়াময়, স্নেহালু হাস্যে তিনি সসেজ তুলে নেন এক হাতে, অন্য হাতে আরেক জনের প্লেট থেকে কাজু। সবচেয়ে ছোটটার ফুলো গালটা টিপে দিয়ে বলেন—'থ্যাংকিউ'। সে অবাক হয়ে বলে—'তুমি তো আমার কাছ থেকে কিছু নিলেই না!'

—'এই যে! ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন তো'—হেসে গৃহকর্তা গেলাশ বাড়িয়ে দেন—'আর বরফ লাগবে ?'

—'বরফ! বাপিয়া কি পাগল হলে ?' গার্জেনের গলায় ধম্‌কে ওঠে বছর দশেকের মেয়েটা।—'কাকুর গলার তো ডেঞ্জারাস অবস্থা! শুনছো না ? কথাগুলো কিছু বোঝা-ই যাচ্ছে না!'

—'কৃকীক্‌ কাণ্ড। এত খারাপ ?' লজ্জা পেয়ে সৌগত বলেন—'বলুন তো শুনি কিছু ? কতটা খারাপ হয়েছে দেখা যাক ?' অনুপমের হঠাৎ একটা আজব পরিহাসস্পৃহা জেগে উঠলো। তিনি সুর করে গাইতে গেলেন—'ড্রিংক টু মি ওনলি উইথ দাইন আইজ'—সৌগত

শিউরে উঠলেন ঘড় ঘড় শব্দের একটানা কাৎরানি শুনে। বললেন, —'থাক থাক, বেটার গিভ ইট আ রেস্ট, স্ট্রেইন করে কাজ নেই।'

এ কোণে তর্ক জমেছে বাংলা উপন্যাস নিয়ে। মেতে উঠেছে পুলক, ললিত, সতী, নীলাব্জ, রমেন। মালবিকা আর শুভাশিস চুপচাপ শুনছে। শুভাশিস নিজে একজন স্বল্পখ্যাত ঔপন্যাসিক, রুমা তার স্ত্রী। মালবিকা নীলাব্জর দক্ষিণ ভারতীয় পত্নী, সে বাংলা বলতে কইতে শিখে গেছে, কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। রুমা এমনিতেই কথা কয় কম। তার কথা সবই চোখে। রমেনের বৌ শুভাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার জন্য সে প্রায়ই এসব পার্টিতে আসতে পারে না।

সর্বাধুনিকদের নিয়ে জোর বিতর্ক হচ্ছে—কে কে ভালো লিখছে, কে কে উঠতির মুখে, কারা এখন পড়তি। কার কী শিল্পকৌশল আয়ত্তে এসেছে, কার কী নেই, কার কী থাকলে ভালো হতো, কোন গুণটা দেশজ, কোনটা বিদেশী আমদানি, কে খাঁটি, কে ভেজাল! আলোচকবৃন্দ প্রত্যেকেই বিদগ্ধ, সর্বজ্ঞ এবং উচ্চদরের সাহিত্যরসিক। বিশ্লেষণ-চাতুর্যে কেউ কারো চেয়ে কম নন, আত্মশ্রদ্ধাতেও না।

অনুপম সাধারণত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে দু'চারটি বুদ্ধিমানের মতো মন্তব্য করা ছাড়া এরকম বিশদ আলোচনায় মাতেন না। তিনি মনে করেন এটা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে।

কৈ, মডার্ণ আর্ট নিয়ে তো লোকে এমন অবাধে অশিক্ষিতপটুত্ব প্রদর্শন করে না, আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যেমন? নিজের সীমা অনুপম রায় জানেন, এদের মতো তা নির্বিবাদে লঙ্ঘন করাটা পছন্দ করেন না। সাহিত্যটা সত্যিই আন্‌প্রোটেক্টেড এরিয়া,—নাকি লিবারেটেড এরিয়া? মুক্তাঞ্চল?

তর্ক চলছে নতুন যুগের নায়কদের মূল কোথায়, তাই নিয়ে। তারা

কি বিজাতীয় আমদানি, তারা কি বাংলা সংস্কৃতির জারজ সন্তান, নাকি তারা এদেশেরই স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ ফলস্বরূপ? পুলক আর নীলাব্জ খুব জোর দিয়ে বলছে মোটেই ওরা কাফ্‌কা-কামু-সার্ত্রের নকল নয়। এসব ছেলেরা কলকাতার পথেঘাটে সর্বত্র জীবন্ত—চরম ফ্রাস্ট্রেশন থেকে যেমন একদিকে বিপ্লবের জন্ম হচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে এলিয়ে নেশনেরও জন্ম হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ললিত, সতী এবং সৌগতর বৌ বলছে ওরা মোটে ভারতীয় চরিত্রই নয়, নকল মাল, ওদের শেকড়-বাকড় নেই, ভারতীয় সমাজে অমন এলিয়ে নেশন হয় না, হতেই পারে না। দু পক্ষেই অনন্ত যুক্তি। যেসব বই, যেসব লেখকের নাম উল্লিখিত হচ্ছে, তাদের কোনোটিই অনুপমের পরিচিত নয়। তারাশংকরের পরে, তাঁর কখন যেন বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ছিন্ন হয়েছে। ললিত-সতী আদর্শবাদের খাপ খুলে যুদ্ধে নেমেছে। মহা উত্তেজিত তারা। নীলাব্জ এবং পুলকেরও উত্তেজনা কম নয়, নায়কদের দেশজ উৎপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে তারা বদ্ধপরিকর। রমেন ভক্তিভরে, নিরপেক্ষভাবে, দুপক্ষেরই বিরোধিতা করে যাচ্ছে। মত্ত কণ্ঠে একের পরে এক তাচ্ছিল্যের চীনে পট্‌কা ছুঁড়ে দিচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশে।

অনুপমের অভিমত কেউই চাইছে না, তাঁর যে বাংলা সাহিত্যে চলাচল নেই, তা সবাই জানে। কিন্তু ওদের দু পক্ষের কথা শুনতে শুনতে অনুপম রুদ্ধ গলার মধ্যে কথার শব্দহীন ঢেউ উঠতে লাগলো। অনুপম ভেতরে ভেতরে বলতে চাইলেন: 'অরিজিন্যাল হোক, না হোক, যদিও আমি ওদের পড়িনি, তবু আমি জানি ওরা সত্য। ওরা এই ভারতবর্ষেরই মাটির ছেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যদিচ ওরা বাস্তব, যদিচ ওরা জীবন্ত, যদিচ ওরা দেশজ, তবুও আমরা ওদের দেখতে চাই না। নিছক ফ্রাস্ট্রেশানের মজ্জা-কাঁপানো এক্সরে চিত্র আমরা চাই না,

অমন সত্য ভাষণে আমাদের কাজ নেই। ফ্রাস্ট্রেশন লীডস টু মোর ফ্রাস্ট্রেশন। এবার চাই আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস। আত্মবিবমিষা, আত্মগ্লানি ঢের হয়েছে। আর না। এবারে সদর্থক সাহিত্য চাই, আশার, ভরসার ছবি চাই, চাই জনসাধারণের মনোবল গঠনের মতো পুষ্টিকর খাদ্য। অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না হলে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ চেতনা গড়ার কাজটা হয় না—শিল্পে সেলফ ক্রিটিসিজম ভালো, কিন্তু সেটা হওয়া উচিত কনস্ট্রাকটিভ্—

অতর্কিতে বুকের মধ্যে সপাৎ সপাৎ করে আছড়ে পড়লো সোমশংকর দত্ত রায়ের স্বর—'উই নীড্ ইয়োর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম।'

মুখে তো চুপ করেই ছিলেন। ভিতরে ভিতরেও এবারে একেবারে চুপ করে গেলেন অনুপম রায়। একটা অপরিচিত ভয় তাঁকে ছেয়ে ফেলতে চাইলো, তিনি মন শক্ত করে বাধা দিলেন। ঘোর বামপন্থী অনুপম রায়ের সাহিত্যিক রচনা বিষয়ক অভিমতের সঙ্গে ঘোর দক্ষিণপন্থী সোমশংকর দত্ত রায়ের রাজনৈতিক রচনা বিষয়ক অভিমতের এ কী মহা অস্বস্তিজনক, প্রায় একাত্মক মিল!…অথচ, তা কী করে সম্ভব?

—'তুমি কিছুই বলছো না যে?'—নীলাব্জ একটা হাল্কা হাতের থাবা বসালো অনুপমের পিঠে।

—'আমার গলা…', বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন অনুপম।

—'আরে? সেদিন থেকেই ধরে আছে?'

—'এ তো অনেক, বেশি খারাপ হয়ে গেছে দেখছি…'

এখুনি উঠে যেতে ইচ্ছে করলো অনুপমের। সকলেই যেমন সাহিত্যবোদ্ধা, সকলেই তেমনি ডাক্তার। এবারে ঠিক হোমিওপ্যাথি ওষুধ সাজেস্ট করবে কেউ না কেউ। হাঁপানির দৈব, আর

গলাধরার হোমিও—এর সংবাদ আপামর রাষ্ট্রগুরু, নারী-পুরুষ-নপুংসক—প্রত্যেকেই বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকেন।

—'সঙ্গে সঙ্গেই ব্রায়োনিয়া থার্টি খেয়ে নেওয়া উচিত ছিলো।'

—'তার চেয়ে ভিটামিন সি ফাইভ হাণ্ড্রেটটা বেশী কাজে দেয়'—

অনুপম মনে মনে অনেক দূরে চলে গেছেন। শুষে নেওয়া গেলাশের স্বচ্ছ তলাটার মধ্য দিয়ে আবার রুমার চিকচিকে ঠোঁটটা দেখার চেষ্টা করলেন। সব কিছুই খুব বর্ধিত দেখাচ্ছে, ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মতো। রুমার বড় বড় চোখ এখন অনেক বেশি বড় হয়ে মোহন রাওকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

—'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়'—অনুপম চম্‌কে উঠলেন। কী বলতে যাচ্ছিলেন তিনি? ওই অর্থহীন, মূল্যহীন, কথাচালাচালির মধ্যে কী বলতে চান অনুপম রায়? বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন—'ইনাফ অফ ইট। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। থোড়বড়িখাড়া তো ঢের হোলো। এবারে বরং কিছু জরুরি কথা বলুন। লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, টাইম ইজ শর্ট।'

—'কাকু? তুমি কিছু বলবে? এই নাও খাতা পেনসিল, তুমি লিখে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' অনুপম চেয়ে দেখলেন সৌগতর মেয়েটা একটা স্কুলের খাতা আর লাল রঙের পেন্সিল এগিয়ে দিচ্ছে—সত্যি সত্যি ওঁর হাত এগিয়ে গেলো, থাবড়ে দি...। ওর লাল ফিতে বাঁধা ঝাঁকড়া ছোটো মাথাটা। খুশি-গলায় বাচ্চাটা বলে—'লিখে লিখে কথা বলো তুমি, কেমন?' খাতাটা টেনে নিলেন। পেন্সিলটা হাতে। খুব জরুরি কী যেন বলবার ছিলো তাঁর। খুব জরুরি একটা কথা আছে। খাতা খুলে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসেই রইলেন অনুপম রায়।

কৃষ্ণমূর্তিদের দিকে মন দিলেন। এখনো চলেছে তুমুল তর্ক।

কমন মার্কেট। একটু শুনেই বুঝলেন ওদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গোড়াতেই একটা বিরাট গলদ রয়ে গিয়েছে, এতো বড়ো জ্বলজ্যান্ত পয়েন্টটা ওরা মিস্ করে যাচ্ছে বলেই তর্কটা এতোক্ষণ চলছে। অনুপম এটা বুঝেই ব্যস্ত হয়ে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন: (লুক হিয়ার, দ্য পয়েন্ট ইজ সিম্পল) 'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।'

—'ও অনুপমকাকু, তুমি অমন করছো কেন? এই তো খাতা রয়েছে, লিখে দাও না?' সত্যি মেয়েটা অস্থির হয়ে পড়েছে।

অনুপম এবার খাতা পেন্সিলটা নিয়ে খস্ খস্ করে লিখতে লাগলেন, পয়েন্টটা লিখে ফেলাই ভালো। আশ্চর্য! এই অব্ভিয়াস জিনিসটা প্রায় দু পাতা ভর্তি লেখার পরে খাতা থেকে মুখ তুলে দেখলেন আট ন' বছরের ছোট্টো একটা মানুষ, ফাঁপানো চুলের আড়ালে দুই চোখে রাজ্যের মমতা, সহানুভূতি বোঝাই করে নিয়ে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপটি করে অপেক্ষা করছে। পাত্লা গোলাপ ঠোঁটের ফাঁকে সদ্য ওঠা দুটো নতুন দাঁত উঁচু হয়ে ফুটে আছে। ঠিক নিরুর কাঠবেড়ালির মতন।

চোখোচোখি হতেই এক গাল হেসে দিয়ে বললো—'এবার নিয়ে যাই?' ফিসফিস করে বললো—'কার কাছে? বিমলকাকু? রাওকাকু? বলো না, কাকে দেবো?' ছোটো হাতটা রাখলো অনুপমের কাঁধের ওপর, পরম স্নেহে।

হঠাৎ শরীরের ভেতরে সব কিছু কেমন গুলিয়ে উঠলো অনুপমের, উনি খাতা ফেলে রেখে ঘড় ঘড় শব্দে 'এক্সকিউজ মি' বলতে বলতে বাথরুমের দিকে উঠে গেলেন।

বাথরুমে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে বমির চেষ্টা করলেন অনুপম রায়।

ভীষণভাবে গা গুলিয়ে আসছে—যেন একটা ভূমিকম্প চলেছে জঠরের গভীরে—কয়েকবার ওয়াক্-ওয়াক্ শব্দ হলো—মাথার মধ্যে

প্রবল অস্বস্তি—বুকফাটা চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো—'ধর্মাবতার, আমি নির্দোষ। আমি নয়, আমি করিনি—ইট ওয়াজন্ট মি…'

বমির চেষ্টা করতে গিয়ে বেসিনে দুই হাতের ভর দিয়ে হা-হা-কার করে কেঁদে ফেললেন অনুপম রায়।

॥ ১৩ ॥

রাত অনেক হলো। বেডসুইচ টিপে এক ঝলক হলদে আলোর মধ্যে চোখমুখ কুঁচকে উঠে বসলেন অনুপম। সৌগতর ওখান থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছেন। মার অনুরাধ রাখতেও খেতে বসেন নি।

কাজ করতেও বসেন নি। নাঃ –

কিছু ভালো লাগছে না।

কিছু নিয়েই ভাবতে ভালো লাগছে না। অয়েল কমিশন সাব-কমিটির পলিসি রিপোর্ট প্রায় তৈরি—ওটা আর দেরি না করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

সেটাও ধরতে ভালো লাগছে না।

কিছুই ভালো লাগছে না?

অপরিসীম ক্লান্তিতে অপর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল কেবল। অথচ চোখে ঘুম নেই।

অনুপম উঠে গিয়ে টেবিলের কাছে চুপ করে দাঁড়ালেন। কাগজপত্র, বইপত্রের ওপরে চোখটা অলসভাবে বিহার করে এলো এক চক্কর। দেয়াল চাপা পড়ে গেছে বইয়ে বইয়ে। কোন্‌টা? কোন্‌টা? কোন্‌টা? একটা বইয়ে চোখটা একটু থামলো। ছেলে বয়সের অতি প্রিয় বই তাঁর। রেজারেকশন। হাত বাড়িয়েও ফিরিয়ে আনলেন। না, থাক্। এখন যদি আর সে রকম না লাগে? চোখ অন্যদিকে চালান করলেন। এশিয়ান ড্রামার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এসেছে, নতুন। নেড়ে চেড়ে দেখবেন? নাঃ, থাকগে।

অনুপম ড্রয়ার খুলে লম্বা বাদামী খামটা বার করলেন। লোকে এরকম খামে ব্যক্তিগত চিঠি লেখে না। অ্যাপ্লিকেশন লেখে। বিল পাঠায়। ঘুম-না-হওয়া ক্লান্ত ঈষৎ অব্যবস্থিত আঙুলে খামটি খুললেন—লেটার ওপনার ছাড়াই। তারপরে আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। অনেকগুলো কাগজ। একগোছা রুলটানা ফুলস্ক্যাপ।

কালো কালিতে বাংলায় পরিচ্ছন্ন লেখা। বাম কোণায় তারিখ। আর অনেকখানি শূন্যতা ওপরে নিচে বাঁদিকে চাপ বেঁধে আছে। সম্বোধন নেই। উলটে পালটে দেখলেন। এক একটা কাগজে এক একটা তারিখ দেওয়া। কোথাও কোনো স্বাক্ষর নেই।

দিনলিপির মতো স্বগতোক্তি।

এর আগেও সুধা এই রকম চিঠি লিখেছে। একবার গবেষণার কাজে ক'মাস মেদিনীপুরে গিয়ে থাকতে হয়েছিল ওকে। তখন। সুধার মুখের কথায় আর চিঠিতে আশমান-জমিন তফাত। কথাবার্তা যেমন কাঠখোট্টা, উদ্ধত, বেমক্কা চিঠি ঠিক তার উলটো। সুধার কথাবার্তা তাঁর ভালো লাগে না। বড়ো বুনো, বড়ো স্পর্ধিত। চিঠি আরোই ভালো লাগে না। সে আরো বন্য। সেখানে প্রাকৃতিক আলো-আঁধারি, আদিম প্রাণের জোয়ার-ভাঁটা। এমন একটা অঞ্চলের দিকে সোজাসুজি পা বাড়ায় সুধার চিঠি, যেখানে ট্রেসপার-দের বিধিমতে প্রসিকিউট করেন অনুপম রায়।

তাই তিন দিন ধরে ফেলে রেখেছেন। ও চিঠি খুলতে তাঁর হাত ওঠে নি।

সুধা মেদিনীপুর থেকে ফেরার পরে সুপরিকল্পিতভাবে এমনই আচরণ করেছেন অনুপম, শেষ পর্যন্ত জংলী সুধাও আর পারেনি। সরে গেছে। দক্ষিণ ভারতে চলে গেছে একটা কাজ নিয়ে।

—'নতুন প্রজেক্টে কাজ করতে ভালই লাগবে তোমার। প্রফেসর রামলিঙ্গম খুব চমৎকার লোক।'—বলেছিলেন অনুপম —'তা ছাড়া ওসমানিয়ার ক্যাম্পাসটাও দারুণ। অ্যাপ্লাই করে দাও। চটপট।'

—'কিন্তু আমার রিসার্চ?'—আর্তনাদ করেছিল সুধা।

—'রামলিঙ্গমের কাছেই কনটিনিউ করতে পারবে ইচ্ছে করলে।'

—'আপনি সত্যি চাইছেন আমাকে তাড়িয়ে দিতে?'

—'কী আশ্চর্য! তাড়াবার এতে কী দেখলে? শোনো সুধা, তোমার অ্যাকাডেমিক টেম্পারামেন্ট নেই। এরকম অ্যাপ্লায়েড কাজই তোমার পক্ষে ভালো হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করে অ্যাপ্লাই করে দাও। আমি বরং একটা রেকমেণ্ডেশন লেটার লিখে দেবো।'

—'ঠিক আছে। রেকমেণ্ডেশনটা করে দেবেন?'

—'কালকে হবে না, একটু ব্যস্ত আছি কমলকলির ওখানে, বরং তুমি পরশু দিন এসো। কিংবা ভাইটাই কাউকে পাঠিয়েও দিতে পারো।'

কয়েকটা নোটিসে সই করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন অনুপম রায়। মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সুধা ঘরে নেই।

সুধা আর আসে নি।

রেকমেণ্ডেশন লেটার লিখে রেখেছিলেন অনুপম। সুধা সেটা সংগ্রহ করে নেয় নি। লোকমুখে শুনেছেন সে হায়দ্রাবাদে চলে গেছে।

দেখা অবশ্য হয়েছিল, ইণ্টারভিউ বোর্ডে। টেবিলের ওপারে সুধা, এপারে ছিলেন সাবারওয়াল আর মঙ্গেশকরের সঙ্গে অনুপম রায়ও। সুধার বেলাতে তিনি কোনো প্রশ্ন করেন নি, তাঁরই ছাত্রী এই সুবাদে। সুধা সবগুলো উত্তর তাঁর দিকে চেয়ে চেয়েই দিয়েছিলো। বেশ স্পষ্ট চোখেই তাকিয়ে ছিলো—ঋজু দর্পিত দৃষ্টি। সেই শেষ। আর দেখা হয়নি।

অনুপম রায়ের রেকেমণ্ডেশন ছাড়াই তার চাকরি হয়ে গেছে।

এই প্রথম চিঠি। প্রায় তিন মাস পরে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে কাগজের গোছাটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

(সুধার চিঠি)

২৪।৪

মন কেমন করছে। সোনা, তোমার জন্যে মন কেমন করছে। এই তো, ট্রেন চলছে যেন কোন্ অন্তহীন নদীর সেতু পেরিয়ে ঘন অন্ধকার কাঁপিয়ে, পায়ের নিচের গভীর নিরালম্ব শূন্যতা গম্‌গম্ করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দশদিকে, কখনো বা বাজছে কুটুমকাটুম-মৌরিবাটুম, মাটি জমির ঘরকন্নার সাংসারিক নূপুর, চোখে বিদ্ধ হচ্ছে ছুটন্ত প্লাটফর্মের চকিত আলোর বর্শাফলক। সব কিছুতে, সব সময়ে, বুকের মধ্যে একটাই সাপুড়িয়ার বাঁশির শব্দ, একই যন্ত্র ঘুরছে, চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে স্মৃতি ও বিস্মরণ, উত্থিত হচ্ছে কল্পনার ফণা, তার মাথায় ঝলসে উঠছে গোপন ইচ্ছের মাণিক···

সোনা, আমি চলে যাচ্ছি।

শুনতে পাচ্ছো, আমি চলে যাচ্ছি ?

২৫।৪

বাংকের ওপরে এটা যেন বেশ আরেকটা ছোট্ট ঘর, এখানে কেবল তুমি আর আমি।—অনেক, অনেক নিচে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেটা দৌড়ুচ্ছে, বাংকের সঙ্গে পারবে কেন ? আমার বাংক যে পারস্যের গালচে—ফুসমন্তরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাকে তোমার কাছে। এখন কেবল তুমি আর আমি। তুমি ঃ তুমি আরাম কেদারায় বসে কালকের লেকচার ভাবছো, কিংবা টাইপরাইটারে বসে তৈরি করছো 'রয়জ কর্ণার'-এর পরবর্তী কিস্তি, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার পিঠের কাছে, তোমার চেয়ারের দুই হাতলে দুই হাত রেখে

ঝুঁকে আছি—আমার বুকের ঠিক মাঝখানে তোমার মূল্যবান মস্তিষ্ক ইত্যাদি—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অল্পস্বল্প পাক ধরেছে তোমার চুলে—হ্যাঁ সোনা, তোমারও। বড়ো কড়া পাওনাদার এই শরীর—চল্লিশ তোমাকেও রেহাই দেয়নি। নাকি, পঁয়তাল্লিশ? নাকি, একশো পঁয়তাল্লিশ? সোনা, তোমার বয়স যতো বাড়বে, আমার বাড়বে তার চাইতে একটুখানি বেশি করে। কেননা আমি যে সত্যকে ছুঁয়ে রয়েছি। আর তুমি বড্ডো ভীরু। তুমি সত্যকে শিশুর মতো ভয় করো। নকল দাড়ি নকল গোঁফ সেঁটে তুমি চাও খোক্কোস সেজে থাকতে, আসলে তুমি কিনা খোকনমণি, একা থাকলে নিজের হাত-পাকেও বুকের কাছাকাছি আসতে দাও না। পাছে তারা শুনতে পেয়ে যায় তোমার বুকের গোপন দ্বন্দ্ব? তুমি যাই বলো আর যাই করো, সুধা কিন্তু স-ব জেনে ফেলেছে। সুধা শুনতে পেয়েছে তোমার গোপন মৃদঙ্গের ধ্বনি।

২৬।৪

ট্রেন চলছে কি চলছে না, রাত কাটছে কি কাটছে না, দৃশ্য সরছে কি সরছে না, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এই পথ—এ তো কোনো দিন ফুরোবার নয়। আমি তো কেবলই চলে যাবো, চলে যেতে থাকবো দূরে, যে দূরের কোনো শেষ নেই।

সোনা, আমার সোনা, আমার কেউ-না, আমার সর্বস্বধন, আমার দূর-পর-মহাশত্রু চোখের মণি—এত রাত্রি, এত শব্দ, এই নৈঃশব্দ্য, এই নিচ্ছিদ্র নির্জন নৈঃসঙ্গ, এই বদ্ধতা, এই মুক্তি, এই শুদ্ধতা, এই সুপ্তি, এক থালা আকাশভরা নিবে-আসা তারাফুল সমেত আমি তোমাকে উৎসর্গ করলাম। তুমি নাও বা না নাও, এখন সব তোমার। এই গতি, এই অগত্যা বিষাদ সব তোমার। এই আমি, এই সৌরমণ্ডলের একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ—সব তোমার হলো।

প্রেমপত্র লিখতে নিশপিশ করছে হাতের আঙুল, জিভের ডগা, স্তনের বোঁটা—ওরা সকলেই প্রেমপত্র রচনায় নিপুণ—কিন্তু সোনা, তুমি কি সে চিঠি পড়তে পারবে? তুমি সে চিঠি পড়তে জানো না। এখুনি সকাল হয়ে যাবে। এইবারে থেমে যেতে হবে, এবারে নেমে যেতে হবে। ইচ্ছে করছে ভয়ানক একটা চিৎকার করে উঠি, ভয়ঙ্কর একটা লাফ দিয়ে পড়ি বাইরে, এই নিষ্ঠুর লোহার গাড়ির সব ক'খানা নির্মম চাকায় পিষে দলে চটকে যাক এই শরীর যেখানে এখনো লজ্জা, এখনো লোভ। সেই চক্ষুহীন, রসনাহীন, মূক বধির স্পর্শসর্বস্ব ১৫৩ সেন্টিমিটার, ১১০ পাউণ্ড মাংস হাড় মেদ মিটুলির অশ্লীল পুঁটলিটা যা তোমাকেও বিভ্রান্ত করেছিলো, যা তোমাকে হারিয়ে ফেলেছে—যাক, যাক, তা ধ্বংস হয়ে যাক।

এই ট্রেন কোথায় চলেছে? যেদিকেই যাক সেটা তোমার দিকে যাওয়া। কারণ সব দিকগুলোই তোমার দিক, কারণ আমি তো কেবলই তোমার দিকে··

২০।৫

এখানে এসে বেশ হয়েছে। তুমি আর পালাতে পারছো না। ঐ তো মোষের গাড়িতে ছপটি হাতে সবুজ মেরজাই পরে বসে রয়েছো তুমি, আর সোনার মতো কলসী নিয়ে লাল ঘাঘরা পরে আমি কুয়ো থেকে জল তুলছি।

২।৬

কেবলই মনে হয় গিয়ে দেখবো একটা চিঠি এসেছে। অফিসে মনে হয়, আজকে বাড়িতে গিয়ে দেখবো চিঠি! আর বাড়িতে মনে হয়, আজ অফিসে গেলেই দেখবো চিঠি! অথচ জানি, তুমি আমার ঠিকানাই জানো না মোটে। নামটাই জানো কিনা সন্দেহ।

এখানে কোনো চেনা মুখ নেই, চেনা গাছের ছায়া নেই, চেনা রাস্তার মোড় নেই, এখানে শুধু কাজ কাজ কাজ। আর যখনই কাজ নেই—শুধু তুমি তুমি তুমি।

৮।৬

বুকের মধ্যে সব সময়ে একটা ভরা ভরা ভাব, একটা স্রোত বয়ে বয়ে যাবার মতন ভাব—যেন বুকে দুধ আসছে—বুকে দুধ এলে কি এই রকম লাগে? যেন একটা কিছু অর্জন হয়েছে, যেন উদ্‌ঘাটন ঘটেছে কোনো। এখানে সময় কাটছে যেন স্টীম লঞ্চ চলে যাচ্ছে শান্ত হ্রদের জল কেটে—ঢেউগুলি বহুক্ষণ ধরে চপল রাখছে হ্রদের বুক—আরো অনেকক্ষণ পরেও ফণা তুলে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। এর জন্য কি তোমাকে ধন্যবাদ দেবো?

১২।৬

চোখ বুঁজলেই সেই অলৌকিক মাঠ। সেই নক্ষত্রের চন্দ্রাতপ। সেই চন্দ্রতপ্ত মুহূর্তগুলি ধমনী বিদীর্ণ করে বয়ে যায়। সেই আকাশ-গঙ্গা, মুঠোর মধ্যে চাঁদ, কোলের মধ্যে চাঁদ, গেঞ্জির ভেতর চাঁদের পাউডার, ব্লাউজের ভেতরে চাঁদের দুধ, আকাশে বাতাসে অসীম রোদন, এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে—সেই কি ভালোবাসা? সোঁদা, বিশ্বাস করো সেই ভালোবাসা। মাত্র একটি সন্ধ্যা—শুধু ওই সন্ধ্যাটিকেই তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুব মুহূর্ত—বিশ্বাস করো তুমি, ওই তোমার সত্য, তোমার বিজয়। ওই তোমার ভালবাসা।

তুমি নিজেকে মস্ত জ্ঞানী ভাবো। কিন্তু তুমি কিছু জানো না। তুমি জীবনের ব্যাপার কিছুই শেখোনি। সেই সন্ধ্যা, যেটাকে তুমি মনে করো তোমার পরাজয়ের মুহূর্ত, যার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যে

সুধার সঙ্গে তোমার এই যুদ্ধ, সেই ছিলো তোমার এক পলকের বেঁচে-ওঠা।

ইণ্টারভিউয়ের দিনে তোমার নিবাত নিষ্কম্প মুখ, সাদা কাগজের মতো বোবা চোখ, সেই তোমার নকল দাড়ি গোঁফ—আমি ঠিক ধরে ফেলতে পেরেছি। তাই তো আমার জিৎ। সোনা, ওই তোমার দুঃখ। ওই তো তোমার ভালোবাসা।

এত পর্যন্ত পড়া হলে অনুপম চশমাটা খুলে পাশে নামিয়ে রাখলেন। পড়া কাগজগুলোও নামিয়ে রেখে একটা বই চাপা দিলেন। দেখলেন আরো দুখানা কাগজ বাকি। এইবারে সবগুলো কাগজ ফের তুলে নিয়ে ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরলেন, না-পড়া কাগজ দুটি শুদ্ধু।—আলগোছে দু'হাতের ছটি আঙুলে খামটা ধরে যত্নসহকারে কুচি কুচি করতে লাগলেন সুধার চিঠিগুলি অনুপম রায়। শেষ অংশটা না পড়েই শতছিন্ন হয়ে গেলো। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে দলা পাকিয়ে ওটাকে ক্রমশঃ একটা কামানের গোলার মতো কঠিন কন্দুকে পরিণত করলেন।

এবারে ওটি টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে সরপোষ ঢাকা দেওয়া জলভরা গ্লাসটি টেনে নিলেন। সরপোষের ওপরে নাম লেখা আছে, 'অনু'। এই জলপাত্র তাঁর আকৈশোরের অভ্যস্ত বাসন, উপনয়নের দানসামগ্রীর অংশ। গ্লাসটা যে রূপোর তৈরি, তা কোনো দিনই অনুপম রায়ের খেয়াল হয়নি। আজও হলো না। পৈতেটি ছিন্ন করেছেন বিলেতগামী জাহাজে উঠেই। কিন্তু উপনয়নের দানগুলি সব হারিয়ে ফেলতে পারেন নি।

গ্লাসভর্তি জল তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে উপুড় করলেন অনুপম রায়, এক নিঃশ্বাসে গ্লাস শূন্য করে নামিয়ে রেখে তুলে নিলেন ছেঁড়া চিঠির বলটা—লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়লেন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, ঘরের ঠিক

কোণাকুনি। ঠিক পাখির মতো উড়ে গেলো ওই পাখির ডিমের মতো বলটা—ভদ্র, মৃদু, অভঙ্গুর একটি শব্দ করে পড়লো শূন্য ঝুড়িটার ঠিক মধ্যিখানে।

স্বহস্তের অব্যর্থ সন্ধ্যানে পরিতুষ্ট হয়ে অনুপম উঠে গেলেন বিছানায়। এক মুহূর্তেই—সঘন, শব্দহীন সঙ্গহারা চরাচরব্যাপী অন্ধকারকে ঘরে ডেকে আনলো, তারপর শীলমোহর করে সংরক্ষিত করে দিলো—অনুপমের হাতের মুঠোয় ছোট স্যুইচটার খুট্ শব্দ।

॥ ১৪ ॥

ডাক্তার ব্যানার্জির চেম্বারে ভীষণ ভিড়। যদিও পূর্বাহ্নে সাক্ষাৎ-লগ্ন স্থির করেই এসেছেন, তবুও প্রায় পঁচিশ মিনিট হলো অনুপম রায় স্লিপ জমা দিয়ে বসে আছেন। ডাক আসেনি। টেবিলে রাখা শংকরস্ উইকলি, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ফিল্মফেয়ার পর্যন্ত দেখা শেষ। এবার কেবল বাংলা সাপ্তাহিকগুলো বাকি। উপায় না দেখে বাংলা সাপ্তাহিকই তুলে নিলেন।

অন্যমনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে সম্পাদকীয় পাতাটা পড়লেন। বাঃ, মন্দ তো নয়। বেশ সেন্‌সিব্‌ল। সংযত, ঝরঝরে। সারও আছে, ধারও আছে। কবিতাগুলোয় চোখ বুলোতে গিয়ে চোখ তুলে নিলেন। এখনও এই সব নদী-নারী-নিমপাতা নিয়ে বার্লিগোলা কবিতা লেখা হচ্ছে ? ছাপাও হচ্ছে ? যখন দেশে এই রকম একটা উথলপাথাল সময় যাচ্ছে ! গল্পটা, ছবি দেখে তো মনে হয় প্রেমের। মিঠে-কড়া প্রেমপনার আহ্লাদে গপ্‌পো আজকাল আর পড়তে পারেন না অনুপম। সাহিত্য সমালোচনার পাতাগুলোয় চোখ ঘুরে এলো। মনে মনে ইংরিজি কাগজের সঙ্গে স্ট্যাণ্ডার্ড মাপছেন, সর্বাঙ্গীন তুলনা করছেন—কখনো মনে মনে নাকটা তুলেছেন, কখনো মনে মনে নাকটা তুলছেন, কখনো বা ভুরুটা। হঠাৎ একটা

পৃষ্ঠায় অনুপম রায়ের কুঞ্চিত ভুরু আটকে গেল। অনুপম রায় স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। জায়গাটা কিছুই নয়, একটা ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশ। পিতা তাঁর পুত্রকে দিয়ে একটি প্রার্থনা মুখস্থ করাচ্ছেন। প্রার্থনাটি শিখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলছেন—'সকালে উঠে বলবে, সারা দিন বলবে, বলতে বলতে এর একটা পলি পড়ে যাবে মনের ওপরে।'

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে রায়বাড়ির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠলো অনুপম রায়ের বুকের গভীরে। বাবার পৈতে পরা ফরসা বুকে গঙ্গাস্নানের পর চন্দনের ছাপ—বাবা ঠাকুরবাড়িতেই সারা সকাল, সারা সন্ধ্যে —অনু-নিরুরা যখন দল বেঁধে উঠোনে খেলতো বাবা তখনও সকাল, সন্ধ্যে, সারা বেলা, সারা দিন—শুনতে শুনতে মনের ওপরে একটা পলি পড়ে যাবার কথা? পলি কি পড়েছিলো?

অনুপম ছাপার হরফের প্রার্থনাটি আরেকবার পড়তে চেষ্টা করলেন: 'আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, আমি কামলোভজিৎ বশী'···যেন জন্মের ওপার থেকে ভেসে এলো কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের গভীর, আত্মমগ্ন কণ্ঠস্বর: 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চঃ। নির্মমো নিরহংকারো সমদুঃখঃ সুখঃ ক্ষমী॥'—সাপ্তাহিক কোলে পড়ে রইল, অনুপম রায় আর পড়লেন না। তাঁর কানে বেজেই চললো রায়বাড়ির চওড়া ঠাকুরদালানে কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের গীতাপাঠ।—'সন্তুষ্টং সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'—ওঃ! কী আশ্চর্য লোক! 'এই সব সোনার পিত্তলমূর্তি···।' সারাটা বেলা কাটতো ঠাকুরবাড়িতে, অথচ ভেতরে ভেতরে উনি যে কী চীজটি ছিলেন তা তো বাড়িশুদ্ধ কারুরই জানতে বাকি ছিল না। শোনেন নি জ্যাঠাইমার গালিগালাজ? অনুপম কি শুনতে পাননি বিনুঝির সঙ্গে জ্যাঠতুতো দিদির ননদের সেই ভয়ংকর কথা-বলা? কে না জানতো লোকটার ভক্তি-উন্মাদনা প্রকৃতপক্ষে ব্রা-য়ে ঢেকে রাখা অন্তর্দৈন্যের মতো এক প্রতারক প্রচ্ছদমাত্র। 'হিপক্রিসি, দাই নেম

ইজ রিলিজিয়ন!' এবং ততক্ষণে শাঁখের অন্তরে বিধৃত দূর সমুদ্রের নিহিত কল্লোলের মতো, অনুপমের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হলো পুনরায় সেই ভণ্ড লোকটার গম্ভীর স্বর : 'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ,' ভক্তিমান না হলে প্রিয়ত্ব অর্জন করা যায় না অনু, ঈশ্বরের প্রিয় হতে হলে নিস্পৃহ হতে হয়, নিন্দাপ্রশংসায় অবিচল, শোকে-সন্তাপে, লজ্জা-তিরস্কারে ব্যথাহীন হতে হয়---'অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ—অনু, বাবা, জীবনে সবই অভ্যাসসাপেক্ষ।'

সেই ঠগ, সেই ভণ্ড, সেই অভিনয়পটু বেড়ালতপস্বীর কণ্ঠ বজ্র-মুষ্টিতে টিপে ধরতে প্রবল বাসনা হলো অনুপম রায়ের—ভেতরে অস্থির হয়ে উঠে তিনি শান্তভাবে হাতের পত্রিকার ভাসমান অক্ষরের স্রোতে পুনরায় চোখ ডোবাতে চেষ্টা করলেন।

ডক্টর অনুপম রায়? উর্দিপরা ঘোষক দোরের কাছে এসে ডাকলো।

—'ভক্তি অভ্যাস করো অনু, বিনয় অভ্যাস করো, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হও, তৃণের চেয়েও নিচু—মানদ হও বাবা, অমানী হও, তবেই তাঁর কৃপা পাবে।'

—'আমি মনে করি তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সহজেই সাধ্য—কিন্তু তৃণের চেয়েও নিচু হওয়াটা মানুষের পক্ষে হানিকর। মানদ হওয়া, অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য মান অপরকে দেওয়া প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কর্তব্য, কিন্তু অমানী হওয়া? তা কি সত্যই সম্ভবপর? কেবল সন্তের পক্ষে ছাড়া?'

অনুপম নিজের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। সংসারে বাস করে গতব্যথ হওয়া অসম্ভব। তুমি নিরলস বটে। তুমি অদ্বেষী, তুমি দৃঢ়নিশ্চয়—কিন্তু অনুপম, তুমি কি শুচি? যার পিতা কৃষ্ণচৈতন্য রায়, সে কি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হয়ে যেতে পারে? রক্ত? রক্ত তার কাজ করবে না?

ক্রোমোজোম্‌স্‌? হিপক্রিসি যার পিতৃধন, সে কি কোনোদিন শুচি হতে পারে?

—'অনুপম রায় কে আছেন এখানে? ডক্টর অনুপম রায়?'

—'আমি। আমি অনুপম রায়।'

—'আপনার ডাক এসেছে। উঠে আসুন।'

পত্রিকাটি নামিয়ে রেখে, ব্রীফকেসটি বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম। ঘড়ি দেখলেন। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার।

চেম্বারে ঢুকে, হেসে নমস্কার করলেন। ডান হাতটা কপালে ছুঁইয়ে কেজো গলায় ডাঃ ব্যানার্জী বললেন—

—'বসুন। বলুন শুনি আপনার কী কমপ্লেইন, কী কী অসুবিধে বোধ করছেন? কোথায় কষ্ট হচ্ছে আপনার?'

ঠোঁটে জোর করে হাসি টেনে এনে ডাক্তার বললেন—

— 'নট টু ওয়ারি! ডোণ্ট বি সো ডিপ্রেস্‌ড। ফেটাল তো কিছু হয়নি আপনার? হ্যাঁ, আপনার প্রোফেশনটার একটু যা অসুবিধে হতে পারে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি গাইয়ে নন!' ডাক্তার একটু হেসে হাতটা হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন।—'ইন এনি কেস'—টেবিলের ওপরে অনুপম রায়ের টরেটক্কাবাদনরত কিঞ্চিত স্নায়ুতাড়িত হাতটিতে স্বল্প, উষ্ণ চাপ দিয়ে ডাক্তার বললেন—'আপনার যেটা আসল কাজ অর্থাৎ লেখা, তার তো কোনো ক্ষতি হবে না।'

শিহরিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলেন অনুপম রায়। পুরুষ মানুষের স্নেহের স্পর্শ অনুপমের সহ্য হয় না কোনোকালে। প্রণাম করে উঠলেই বাবা অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে দিতেন পিঠে মাথায়, বিড়বিড় করে আশীর্বচন উচ্চারণের ভান করতেন। জেঠামশায়ের এসব বাতিক ছিল না।

একটু অবাক হয়ে ডাক্তার বললেন—

—'ভয় কিসের ? ভিয়েনাতে এর বেশ ভালো চিকিৎসার, মানে অপারেশনের ব্যবস্থা আছে। আপনাদের তো দেশ-বিদেশে যাতায়াত আছেই—ভিয়েনা থেকে বরং অপারেশনটা করিয়ে ফেলুন।'

—'ডক্টর, আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি চিরকালের মতন আমার কণ্ঠস্বর হারাবো ?'

—'ওয়েল···ইন্ আ ওয়ে···শেষ পর্যন্ত, ম্ ম্ ম্· আই এ্যাম এ্যাফ্রেইড' ·· তারপরেই সহজ, তরলকণ্ঠে বললেন—'আজকাল তো ভয়েস বক্সটা রিপ্লেস করা কিছুই না! ইট উইল নট বি ইয়োর নর্মাল ভয়েস, কিন্তু কাজ চলে যাবে। সব কথাই বলতে পারবেন—উইথ এ সিম্পল এ্যাণ্ড সায়ান্টিফিক ফলস ভয়েস।' ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে ফীজ-এর খামটা তুলে দেরাজে ভরলেন।

—'মনে রাখবেন, স্মোকিং ইজ ডেডলি ফর ইউ। একটা কর্ড আপনার একেবারেই গেছে—এ্যাণ্ড দি আদার ইজ অলমোস্ট গন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় গলাগুলোর বারোটা বাজিয়ে ছ্যান আপনারা। একেই তো কলকাতার বাতাস ইনহেল করা মানেই—থ্য ড্যামেজ ইজ ইকোয়াল টু স্মোকিং টোয়েন্টি সিগারেট আ ডে!'

অনুপমের চকিত দৃষ্টি ডাক্তারের হাতের কাছে রাখা লাইটার আর 'ভাজির'-প্যাকেটটার ওপর একবার ঘুরে আসে। তিনি মুখে হাসি মেখে বলেন ঃ

—ডাক্তারবাবু, আমি আর কতদিন পর্যন্ত কথা কইতে পারবো ?'

—'বলবেন না। একদম বলবেন না। গান্ধীজীর সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করার কথাটা মনে আছে তো? আপনিও একজ্যাক্ট্‌লী অমনি করুন। কেবল সপ্তাহে সাতটা দিন। এখন তিন হপ্তা ঘরে বসে থাকুন চুপচাপ। গলাকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।'

—'তাহলে কথাটথা আর বলতে পারবো না বলছেন। ওটা গেল। এঁ্যা? আ পার্মানেন্ট লস?'

—'কি মুশকিল। আরে! আমি কি তাই বলছি? এখন কেবল তিন সপ্তাহ বলবেন না। অপারেশনটা মনে হয় করিয়েই নিতে হবে। তবে, হোয়াই ওয়ারি? যান, এই ম্যাক্রাবিন আর ভিটামিন ইঞ্জেকশন দুটো তিন সপ্তাহ এবং এই স্টেরয়েড আর এই অ্যান্টিবায়োটিকটা দশদিন ঠিক যেভাবে যেটা লিখে দিয়েছি, সেই-ভাবেই চালিয়ে যান। এ্যাণ্ড গিভ্ ইয়োর ভয়েস এ কমপ্লীট রেস্ট। কেমন? সী মি আফটার থ্রি উইকস্! ম্—কেমন? আচ্ছা?' প্রায় সোমশঙ্করের মতো অমোঘ অন্তিম উচ্চারণে 'আ—চ্ছা' বলেই টেবিলের ওপরে রাখা ঘন্টিটা সবিনয়ে বাজিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। মুখের কাজ ফুরোবার অমল হাসি। 'থ্যাংকিউ ডক্টর!'

—'ওয়েলকাম! নেক্স্ট?'

ডাক্তার ব্যানার্জীর ওখান থেকে বেরিয়ে অনুপম রায় ঘড়িটা দেখলেন—পার্ক স্ট্রীটেই আছেন—কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। কমলকলি ফ্লুরিতে আসবে সাড়ে চারটের সময়ে। ঢের দেরি। এখন লাঞ্চ আওয়ার—যেখানেই যাবেন, ভিড়। লেকচার দিতে যাবার প্রশ্ন নেই। কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ। এখন বরং এই সামনের দোকানটাতেই ঢুকে পড়া যাক্।

কফি আর স্যাণ্ডুইচ অর্ডার দিয়ে অনুপম ভাবলেন কাগজের অফিসেই ঘুরে আসবেন একবার।—সঞ্জীব সকালে এসেছিলো। লেখাটা দিতে পারেন নি। ছ' বছরের মধ্যে এই প্রথম বিচ্যুতি—এ সপ্তাহের 'রয়জ কর্ণার' যাচ্ছে না।

অবশ্য এই দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে লিখেও ফেলা যায়। এই টেবিলে বসেই। খাদ্য এখনও আসেনি। এলেও অসুবিধে নেই। ব্রীফকেস খুলে প্যাড আর কলমটা বের করলেন অনুপম।

ওঃ হো, মাকে একটা ফোন আগে করে দেওয়া দরকার। মা তো না খেয়ে বসে থাকবেন !

ওইটুকু কথাও ফোনে বলতে বেশ কষ্ট। মা ভালো কানে শোনেন না। অনুপমের স্বরও আজকাল শ্রুতিসাবলীল নয়।

কফিটা গলায় আরাম দিল। আঃ, কী সুখের এই মুহূর্ত। ঘরটার শীতলতা বাহ্য শরীরকে স্নিগ্ধ করছে, পানীয়ের উষ্ণতা অভ্যন্তরকে উষ্ণ করছে। আঃ ! এই তো ইন্দ্রিয়সুখ !

কলম খুলে বসলেন। দেখা যাক। হতে পারে পঙ্গুকে যিনি গিরি লঙ্ঘন করান, মত্ত করীকে তিনিই পঙ্কে কর্দমে বন্ধ করে ফেলেন। কিন্তু 'যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'—সে নিশ্চয়ই পঙ্ক-কর্দম থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় মোটামুটি একটা দাঁড়িয়ে গেলো। না, এবারে স্বদেশ নয়—ওই অয়েল ক্রাইসিসের রিপোর্টের ভাবনা থেকেই কিছুটা ধার নিয়ে, দিব্যি দু' কলম ভর্তি করার মতো ম্যাটার হয়েছে।

হঠাৎ পরিশ্রান্ত নিঃশেষিত বোধ করলেন অনুপম রায়।

বিল মিটিয়ে দিয়ে আবার পথে বেরোলেন—আর কফি নয়। একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে হবে এবার কোথাও ঢুকে। গলায় বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তারপরে লেখাটা জমা দিতে হবে, যদিও টাইপ করা হয়নি। কমলকলি আসুক আগে, তারপরে লেখাটা জমা দিলেই চলবে।

বার-এ ঢুকেই প্রথমে দেখতে পেলেন রমেনকে। রমেন, মাহিন্দর, শুভাশিস এবং আরো কিছু উস্কোখুস্কো মণ্ডপ। শিল্পী-টিল্পি হবে আর কি, আঁকে-টাকে কিংবা লেখে-টেখে বোধহয়। আজ ওদের কাছে যেতে ইচ্ছে করলো না। মনটা ঠিক নেই। অনুপম অন্য একটা টেবিলের দিকে এগোলেন।

কিন্তু তিনি যেতে না চাইলেও, তাঁর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে

রমেন জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে, আরে, বড়দা, যে! বড়দা, এসো ভাই, এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি। দুটো ফ্রী জ্ঞানের কথা বলে যাও। দুটো নীতিকথা শুনিয়ে যাও বড়দা। লক্ষ্মীটি।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনুপম রায়। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য এ্যানটেনা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি রমেনের মেজাজের একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করলেন। কান দুটো দিয়ে অগ্নিক্ষরণ হচ্ছে। রমেন তো তাঁকে 'তুমি' বলে না, যতোই মাতাল হোক, তাঁর সামনে এভাবে বেচাল হয় না। রমেন তাঁকে নাম ধরে 'বাবু' যোগ করে সম্বোধন করে। 'বড়দা' বলে না।

—'এস্সো বড়দা, বোস্সো বড়দা, এবার বলো দিকি তোমার মাও-বাবা আর কী কী ফুসমন্তর কানে দিয়েছে? কী? বলবে না? কেন ব্রাদার? রাগ হয়েচে বুজি? এ্যাঁ? আমিই বলি তাহলে? বলি? স্সোনো: মাও-বাবা বলেছেন দিনের বেলা কেবল গাড়ি করে করে বারএ বারএ ঘুরবে। আর সাঁঝের বেলা মেয়েছেলের সঙ্গে রং চড়াবে। আর যদি তারি ফাঁকে সুযোগ পাও তবে লম্বা চওড়া বাতেলা দিয়ে কচি কচি ছেলেগুলোকে স্সোওজা টর্চার চেম্বারে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিয়ে, লিজেরা লেজ তুলে লম্বা দেবে। এ্যাঁ? ঠিক বলিচি না? বল্ শ্যালা, ঠিক বলিচি কিনা? আয় শ্যালার ব্যাটা, তোদের আঁতেল্গিরি· বের করে দিচ্চি, তোদের বিপ্লবীপনার শখ ঘুচিয়ে দিচ্চি আয়—মিথ্যেবাদী, জালিয়াৎ, জোচ্চোর, বিদেশী টাকা-গেলা, ভাঞ্চৎ মার্ডারার, হিপক্রিট—'

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াতে গিয়ে রমেনের মাথাটা হঠাৎ নেতিয়ে পড়লো। শুভাশিস, মাহিন্দর এবং আরো দু' চারটে জটাজুটধারী জীব রমেনকে ঠেশে ধরেছে। বেয়ারারাও ছুটে গেছে তার দিকে। ইতিমধ্যেই হাতের তরল পদার্থ-ভরা গেলাশটা রমেন অনুপমের উদ্দেশে ছুঁড়েছিলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা দেওয়ালে লেগে ঝনঝনিয়ে

গুঁড়ো হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়লো। ঘরের বাতাস রাম-এর কড়া গন্ধে হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

রমেন এখন টেবিলে মাথা রেখে নিশ্চল। তার সেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশী রুদ্রদৃষ্টি এখন জামার হাতায় গোঁজা।

শুভাশিস সংকোচ-জড়ানো পায়ে এগিয়ে এসে স্থাণু, নির্বাক অনুপমের শ্রবণহীন কানে অজ্ঞাত কোন ভাষায় কী সব কথা বলে যাচ্ছে।

অনুপমের পা যেন শত শত বৎসরের বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো মাটিতে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু তিনি তো পাদপ নন। তিনি পা দিয়ে মাটি থেকে প্রাণরস পান করবেন কি করে। অনুপম বুদ্ধির হাতলটা চেপে ধরতে চেষ্টা করলেন—চলন্ত ট্রেনের দরজার মতো সেটা কেবল যেন সামনে দিয়ে পিছলে পার হয়েই যাচ্ছে। বদ্ধবধির গুহার অভ্যন্তরে কেবল গেলাশ ভাঙার ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ হাজার বছর ধরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো···

তারই মধ্যে এক সময়ে অনুপম রায়ের কেমন আবছা মনে হলো, অনেক দূর থেকে, অতি অস্পষ্ট লাইনে, অর্ধস্ফুট আওয়াজে, যেন ক্রস কনেকশন হয়ে কোনো টেপ্-করা মেসেজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—

—'কিছু মনে করবেন না অনুপমদা, রমেনের আজ মাথা-টাথার ঠিক নেই—আজই ভোরবেলায় সোমেনের বডিটা গঙ্গার ধারে পাওয়া গেছে। এটা ওদেরই পার্টির ভেতরের কাজ বলে মনে হয়।'

॥ ১৫ ॥

ফ্লুরিতে কমলকলির সঙ্গে টী-য়ের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন অনুপম রায়, তবে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো। এবং গিয়েও একেবারেই কথা বলতে পারেননি। কাগজের অফিসে গিয়ে লেখাটা জমা দেওয়ার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। প্রথম লেখাটা

না-ই তৈরি হোলো, নতুন করে একটা যখন লিখে ফেলেইছেন—জমা না দেবার কোনো মানে হয় না। না হয় কিছুদিন বহির্বিশ্ব নিয়েই লিখলেন। কিন্তু তাঁর হাত-পা বেঁধে দিলো তাঁরই ভেতর থেকে কোনো বিরুদ্ধশক্তি। তৈরি থাকা সত্ত্বেও 'রয়জ কর্ণার' এবার প্রেসে গেল না। এই প্রথম।

রমেনের গ্লাস ভাঙবার পরে কখনো ফের নড়ে উঠেছিলো অনুপমের পা দুটো, বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি ওই ঘর ছেড়ে, সোজা চলে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে।

রমেনের ছোটো ভাইটির নিরুদ্দেশ হবার খবর মাস দু'তিন ধরেই শুনছেন—আজ তাহলে তার উদ্দেশ মিলেছে।

অনুপম রায় গঙ্গার ধারের ছোটো দোকানে এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক কিনলেন, আর একটা দেশলাই। একবারও মনে পড়লো না—মাত্র ক' ঘণ্টা আগেই ডাক্তার ব্যানার্জী কী উপদেশ দিয়েছেন। ধূম-পান তিনি বড়ো একটা করেন না, চা-কফি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো নেশাই নেই অনুপম রায়ের। নেশার চাকর না হওয়াটাই তাঁর মস্ত এক নেশা।

অথচ আজ, নিঃসঙ্গ এই নদীকূলে, রৌদ্রছায়ায় ভরা বয়স্ক পিপুল-গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে পিঠে হেলান দিয়ে বসে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চললেন অনুপম রায়। অশেষ ধূম্রকুণ্ডলী ঝুঁকেই রইলো তাঁর নাক, মুখ, চোখের সামনে। যেন শরীরের গভীরে একটা অনির্বাপিত অগ্নিকাণ্ড চলেছে।

অনুপম রায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মনটাকে ফাঁকা রাখতে খুব চেষ্টা করলেন—ফাঁকা কি রাখা যায়? কী করি, কোনদিকে তাকাই, কী ভাবনা ভাবলে সব ভাবনা এড়ানো যায়? —'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ'—আহ্! রায়বাড়ির হাত থেকে কি অব্যাহতি নেই? স্মৃতির কি বিনাশ নেই? 'স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ' কথাটা ঠিক

নয়—কখনো কখনো স্মৃতিকে বিনাশ না করলেই বরং বুদ্ধির সমূলে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। এবং 'বুদ্ধিনাশাদ্ প্রণশ্যতি' একথা ধ্রুবসত্য।

অনুপমের চোখ চেষ্টা করে তাঁর মন ভোলাতে। নদীর ওপর দিয়ে এই ভরা দুপুরেও কতো নৌকো যায়। পালতোলা। বৈঠাটানা। ছইওয়ালা। ছইবিহীন। এপার-ওপার ফেরীর স্টীমার। মোহনার দিকে চলে যাওয়া স্টীমার। উজান বাওয়া স্টীমার। একহারা। দোহারা। বোঝাই। শূন্য। একটা ছোটোখাটো বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। সুদূর এক মহাদেশের নামে তার নাম।—কী করছে ওই ভিনদেশী মহাদেশ আমাদের এই হুগলী নদীর গেরুয়া-জলে? কোনোকালেই নাড়ির যোগ নেই এর সঙ্গে ওর—অথচ ত্যাখো, কেমন সুন্দর গা ভাসিয়েছে একজন আরেকজনের বুকে!

অনুপম জল থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললেন—পড়ন্ত পশ্চিমের রোদে চোখ মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। আড়াল গড়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন সেই তেজ থেকে, হাত চাপা দিলেন চোখে। গোল গোল কমলা-রেশমী আলোর বৃন্তহীন ফুলের পর ফুল ফুটলো নিঃসীম কালোর সমুদ্রে। ক্রমশ সেই কমলা পাকা থেকে কাঁচা ফল হয়ে যেতে লাগলো. পরিণত হলো সবুজ জ্যোতির ফুলকিতে —তারপর সারি সারি নীলকান্ত মণি। চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অনুপম দেখলেন জ্বলন্ত শূন্যে এক ফোঁটা এক জেদী চিল, কী এক দুরন্ত শ্বাসের বশে ঘুরছেই···ঘুরছেই···। শূন্যকেই কেন্দ্র করে, শূন্যের মধ্যে বৃত্তের পরে বৃত্ত রচনা করে চলেছে, চক্রাকার জেদের অস্থির ব্যূহের মধ্যে বন্দী চিল।

থিওরি অফ রেলেটিভিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, বান্ধবী আসার পূর্ববর্তী এক ঘণ্টার দৈর্ঘ্য হোল অন্তহীন [যেন দ্রৌপদীর শাড়ি]—অথচ বান্ধবী এসে পড়ার পরের তিন ঘণ্টা কতো বেশি সংক্ষিপ্ত [যেন আ-ঢাকা কর্পূর]!

সেদিন অনুপমের অভিজ্ঞতা কিন্তু তা ছিল না।

যখন পৌছুলেন তখন বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে, কলি আগে থেকে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে। খুব সেজেছে আজ। আগুন রঙের হালকা শিফন শাড়ি ঐ রঙেরই একচিলতে বক্ষোবাসের সঙ্গে মানিয়েছে সুন্দর, ঘন কালো ফাঁপানো চুলের গুচ্ছ যেন পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মতোই লতিয়ে ঝেঁপে আছে ঘাড়ে। কপালে। কাঁধে। বুকের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে এও খেয়াল হলো অনুপমের, যে উপমাটা তাঁর নিজের নয়। অশোকপুষ্প ও ভ্রমরপুঞ্জের সেই ক্লাসিক উপমাটি স্বয়ং উপমা-বিশারদের তৈরি। অবশ্য যাঁরা লিখেছিলেন উপমা কালিদাসস্য—তাঁরা তো আর অলটাইম উপমা-ওস্তাদ উইলি শেক্সপীয়রকে চিনতেন না!

হঠাৎ ঘৃণায় জর্জর বোধ করলেন অনুপম রায়। এখনও ? এখনও তোমার মার্জিত-বুদ্ধি নন্দনতত্ত্বের চোরাকারবারে মত্ত, অনুপম ?

টেবিলের ওপরে ঝকঝকে বাদাম আর টকটকে চেরি-বসানো সুইস পেস্ট্রির পাশে এলিয়ে থাকা কমলকলির মাখনের মতো নরম হাতটি হীরের আংটিতে, রক্তিম নোখে পেস্ট্রির মতই মচমচে, স্বাদু—অথচ ছুঁতেই ইচ্ছে করলো না আজ। কলির শাড়ি যথারীতি স্থানচ্যুত হলো বার বার, কিন্তু অনুপমের চোখ পিছলে ফিরে এলো চায়ের কাপে।

গলা দিয়ে একেবারেই স্বর নিষ্কাষিত হচ্ছে না। প্যাকেটে আর মোটে দুটো সিগারেট বাকী। অনুপমের সংসর্গে যাদৃশী ঝলমলে, চিত্তাকর্ষক, জড়োয়া বাক্যালাপে কমলকলি অভ্যস্ত, আজ তা না পেয়ে সেও কেমন বোরড হয়ে রইল।

দুজনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য কাচের দেওয়াল—সেখান থেকে ওপারের সব দেখা যায়, কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। ঢং ঢং করে বুকের ভেতরে একটা ঘণ্টা পড়চে : জমছে না! জমছে না!

—'বারে বা, আমাকে ডেকে নিয়ে এসে একটাও বুঝি কথা বলতে হয় না?'

—'ঘড়ঘড়···' (আমি সত্যিই খুবই তুঃখিত যে···)

—'থাক থাক, গলায় এতো কষ্ট? থাক, কথা কইতে হবে না। বরং আমিই বলি। আপনি শুনুন। এখন কথা হচ্ছে; কী বলব?'

কোনমতে অর্ডার দেওয়া হলো খাদ্য-পানীয়। কমলকলি সহানুভূতিতে দ্রব হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো, তাঁর দিকে চোখ মেলে। এই করুণা দৃষ্টিটা নন্দ লাগছিলো না, একটা মজা পাচ্ছিলেন অনুপম। ইতিমধ্যেই কলি বলার কথা খুঁজে পেয়ে গেলো:

—'আজ আমাদের উইমেনস কো-অপ্ কমিটির মিটিং ছিল এই পাশেই, পার্ক হোটেলে। একটা চ্যারিটি লাঞ্চের প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে, মাদার টেরেসার জন্য। তুশো সীট থাকবে, মাত্র পঁচিশ টাকা করে সিংগল টিকিট। ডাবলস পঞ্চাশ। আপনি মশাই ডাবল কিনবেন। বুঝলেন?'

বশংবদ সম্মতিতে মাথা হেলিয়ে ওষ্ঠাধরে মোলায়েম অমায়িকতা টেনে এনে সামাজিক কর্তব্য পালন করলেন অনুপম। ঠোঁট নেড়ে বললেন—'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'—এই আশ্বাসে ভুবনের কোথাও কোনো শব্দ হোল না।

—'থ্যাংকিউ। এখনই না অবশ্য। দেরি আছে। ও-মাসের সেকেণ্ড স্যাটারডে-তে। আজকাল তো সানডে-তে রেস হয়, তাই রবিবারটায় করা মুশকিল।'

গভীর বোদ্ধার মতো সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়লেন এবারে অনুপম।

[—অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। আমি কি শুচি? শুচি কে? সোমেন? সমীর? অনপেক্ষ হওয়া মানে কি 'ব্যক্তিগত' ফলের অপেক্ষা না রেখে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া?—সেটাই তো সন্তদের পুণ্যকর্ম।

কাজের ফল তো একটা থাকবেই—সেটার ভোক্তা নিজে না হলেই হোলো।]

—'জানেন, 'এ্যাডাম এ্যাণ্ড ঈভ' পত্রিকার জন্মে আমি মাদার টেরেসার একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছি। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি নেক্সট উইকে। শিরিণ ডালমুটওয়ালা আর আমি--দুজনে মিলে লিখছি ফীচারটা।'

[ওহ্ ! নিজে সেধেই এই মৃত্যু-যন্ত্রণা বুকে তুলে নিয়েছি। এখন কী উপায়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কমলকলির কলকাকলি থেকে ? টী-পটের চা ফুরিয়ে গেছে, এই রক্ষে। ফুরোলে আরো না নিয়ে, এবার উঠে পড়লেই হবে।]

—'বলুন না ? মাদার টেরেসাকে কী কী প্রশ্ন করা যায় ? থাক, এখন কথা বলবেন না—বরং বাড়িতে ফিরে ভেবে-চিন্তে একটা কোয়েশ্চেনেয়র তৈরি করে দেবেন, কেমন ? মাদার টেরেসা ইজ, আফটার অল, আ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সেইন্ট ! তাঁর ইন্টারভিউটা ভাল হওয়া দরকার।'

[আ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সেইন্ট। ইদানীং কথাটা খুব চালু হয়েছে। কিন্তু সন্তদের আবার শতক ভাগ হয় নাকি ? সন্তরা তো মৃত্যুহীন ! কিন্তু গতব্যথঃ নন। গতব্যথঃ হলে আর সন্ত হওয়া সম্ভব নয়। সন্তের গুণই তো ব্যথা পাওয়া। সন্তের হৃদয়ে অনন্ত বেদনাবোধ। এবং তারই সঙ্গে অনন্ত সহন। আমি তো সন্ত নই, আমি আর পারছি না।]

গাড়িতে বসে কলি বললো—'চলুন গঙ্গার ধারে, সানসেটটা দেখে যাই।' গাড়িতে কি তালভঙ্গ হোলো অনুপমের ? কলির কান ঘেঁষে নেমে এসে বুকের ঠিক মাঝখান পর্যন্ত গেঁথে রয়েছে গনগনে লাল একটা তীক্ষ্ম আলোর ফলা। অস্তসূর্যের শেষ মার। রোস্ট-করা-হচ্ছে

এমন মুণ্ডহীন মুরগীর শিকবিদ্ধ ধড়টার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। চোখটা সরে গেলো—আরেকটু ছায়াময়তায়। সেখানে, শেয়ালদার বাজারে ফলের টুকরির ঢাকনি ফাঁক করে যেমন উঁকি মারে অবাধ্য কমলালেবুরা, তেমনি ব্লাউজের ঢাকনি অগ্রাহ্য করে উঁকি মারছে ঝুড়িভর্তি পাকা ফল। অনুপমের স্টিয়ারিং আপনা আপনি গঙ্গার দিকে চলা ঠিক করলো।

কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই মস্ত এক লাঠি হাতে একটা রোগা পাতলা পাথুরে শরীর দু' মানুষ উঁচু বেদীর ওপরে খাড়া দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে পা বাড়িয়ে আছে।

হঠাৎ এই নগ্নপ্রায় প্রহরীমূর্তির সামনে পড়ে গিয়েই, কী করে যেন অনুপমের হাতের স্টীয়ারিংটা অন্যমুখে ঘুরে গেলো!

—'কই, গঙ্গার ধারে যাবেন না?'

ডান হাতে আঙুল দিয়ে নিজের গলাটা আলতো করে চেপে ধরলেন অনুপম রায়। চোখে কষ্টের চেহারা ফোটালেন। মাথাটা নিরুপায়ভাবে ডাইনে-বাঁয়ে হেলালেন বারকয়েক। কতোটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে এই আত্মসংযমের নির্দয় পন্থা বাধ্য হয়ে নিতেই হচ্ছে তাঁকে, কেবল গলার কষ্টটার জন্যেই—সে বিষয়ে কমলকলির সরল হৃদয়ে কোনো সংশয় রইলো না।

—'পুয়ার থিং!' সহানুভূতিতে লাল টুকটুকে চেরীফলের মতো গোল হয়ে গেলো ঠোঁট দু'খানি—ফলের মাছখানটা অল্প ফেটে গেল। সেই ফোকর দিয়ে দেখা গেল ধবধবে দাঁতের পিছনে গোলাপী জিব ঠেকিয়ে বাব্‌ল্ গাম-এর মতো গোলালো চুক্‌চুক্ শব্দের বুদ্বুদ তৈরি করছে কলি। পুরুষ অনুপমের ক্লান্ত শরীরে সেই দৃশ্য, সেই শব্দের একটা অমোঘ সতেজ ক্রিয়া শুরু হলো।

এমন সময়ে তাঁর মনে পড়লো: পিকিনিজ কুকুর ডার্লিংকে আহ্বান জানাতেও কলি একই শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

আপনিই গাড়ির গতি কখন দ্রুত হয়ে উঠেছিলো নাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। খেয়াল হতেই অনুপম আবার নিজের সঙ্গে কথা বললেন।—আস্তে চালাও অনুপম, তোমার তো সত্যি কোনো গন্তব্য নেই। তাড়াটা কিসের? আস্তে, অনুপম, ধীরে। এবারে স্পীডটা কমিয়ে ফ্যালো। একটু দেরি হলে কী ক্ষতি? একটু পেছনে পড়লে কী ক্ষতি? শান্ত হও অনুপম, স্থির হও।

॥ ১৬ ॥

কমলকলিকে নিরুৎসব বিদায় দিয়ে বাড়িতে ফিরে 'কেষ্ট' বলে ডাকতেই যে স্বরটি বেরুলো তাতে অনুপম রায় এবং কেষ্ট উভয়কেই যুগপৎ যারপরনাই বিচলিত দেখালো।

—'দাদাবাবু, বড় ডাক্তারবাবু কী বললেন? গলা তো আরো খারাপ দেখছি।'

—'আবার দেখাতে হবে।'

—'ছোড়দা এসে মাকে নিয়ে গেলেন। মা আপনার জলখাবার গুছিয়ে রেখে গেছেন। এনে দিই?'

মাথা দুলিয়ে খাণ্ডে অসম্মতি জানিয়ে অনুপম ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বার করলেন সম্প্রতি ভুটান থেকে আনা করোনেশন হুইস্কির বোতল, ফ্রিজ থেকে নিলেন ঠাণ্ডা সোডা। বরফ? না থাক। একটা সুদৃশ্য গ্লাস বেছে নিলেন।

ওঃ, কীভাবে অপচয় হোলো দিনটা। পুরো একটা ওয়ার্কিং ডে অপব্যয়। একটা লেখা যদি বা তৈরি করলেন, সেটুকু সময়ই যা সদ্ব্যবহার করা গেছে—সেও তো জমা দিলেন না। তক্ষুণি উঠে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করতে লাগলেন। 'ডেইলি নিউজ' উত্তর দিতেই তিনি মুখার্জীকে চাইলেন। কিন্তু অপরপক্ষ কেবলই বধিরের মতো

হ্যালো ? হ্যালো ? হ্যালো ? বলে গেলো। কাকে চাই ? আপনার কাকে চাই ? বলুন আপনি কাকে খুঁজছেন ? অনুপম বললেন, তাঁর কাকে চাই। তবুও 'ডেইলি নিউজ' কিছু শুনলো না। কানেকশন কেটে দিলো।

কেষ্ট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অনুপম ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন আরাম কেদারায়।

—'ফোনটা করা গেল না ?' কেষ্ট বললো। —'ফোনটা করবেন ? আমি করে দিলে হবে ?'

অনুপম এক মুহূর্ত ভাবলেন, হ্যাঁ। কেষ্ট বাংলাতেই ফোন করে মুখার্জীকে খবর দিতে পারবে। পিওন পাঠিয়ে ওরা নিয়ে যাক লেখাটা। তারপর মনে হলো—কেষ্টই যাক না—পৌঁছে দিয়ে আসুক। ঘণ্টাখানেকের মতো একা থাকার সম্ভাবনায় মনটা উৎসুক হলো।

ইঙ্গিতে ব্রীফ-কেসটা চাইলেন। কেষ্ট ব্রীফ-কেস এনে দিলো।

লেখাটা বের করে, একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন। চলবে। খামে ভরে ওপরে ঠিকানা লিখে কেষ্টর হাতে দিলেন। কেষ্ট ঠিকানাটা দেখা নিয়ে বললো—

—'এইজন্যেই ফোন করছিলেন ? আমার রান্না তো সকালবেলাই শেষ। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।'

'রয়েল কর্ণার' বন্ধ হবে না। এ সপ্তাহেও বেরুবে। অনুপমের মনে আরাম হোলো। সত্যি, কী করে যে ওটা আটকে দিচ্ছিলেন। এটা বন্ধ করার সঙ্গে সোমেনের মৃত্যুর কী যোগ ? কোনো যোগ থাকতেই পারে না।

মনটাকে জোর করে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন—না, ওকথা নয়। সমীর নয়। অন্য কথা ভাবো। কেষ্ট দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বাড়ি এখন শূন্য। এখন কার কথা ভাববো? কলি নয়। নলিনী দেশপাণ্ডে? শোভনা দাশগুপ্ত? রুমা? শুভাশিসের স্ত্রী। একটা সারারাত জাগা নিউইয়ার্স ঈভ পার্টির ভোররাত্রের দিকে হঠাৎ রুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিলো। সেই থেকে তিনি সন্তর্পণে রুমাকে এড়িয়ে চলেন। রুমার ভেজা চকচকে ঠোঁট, তার টলটলে, অবাস্তব কথায় ভরা চোখকে তিনি ভয় করেন। আর ভয় করেন সুধাকেও। সুধার শাদামাটা তাঁতের শাড়িকে, তার ক্ষয়ে যাওয়া কোলাপুরী চপ্পলকে, তার সোজাসুজি ছোরা বসানোর মতো চাউনি, তার চাবুকের মতো বিনুনীটাকেও। সেটা বুকের ওপরে টেনে নিয়ে, আঙুলে জড়াতে জড়াতে সুধা তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখে নেবার ভান করে। সুধাকে সব সময়ে কেমন গুলি-ভরা বন্দুকের মতো খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়--এমনকি সুধা-বিষয়ক ভাবনাটাকে পর্যন্ত।

গুলি। বন্দুক। সমীর কি জেল হাজতে? তিনি সমীরের জন্য ল' ইয়ার লাগাবেন। সমীর নিজের হাতে কোনো প্রাণহানি করেনি নিশ্চয়। নিশ্চয়ই না। সমীর অন্তত না। অবশ্য এ-সব ছেলেরা যে সব সময়েই নির্ভুল তা নয়। প্রায়ই ভুল করে। হিংসার পথ, আফটার অল, প্রায়ই ভ্রান্তিময়।

(সুধা বললো : 'প্রায়ই' কেন? আপনি কি ইচ্ছে করেই ভেগ্ হয়ে যাচ্ছেন? ভেতরের কুনো অনুপমটা টিপ্পনী কাটলো : নাকি ওটা এ্যাকাডেমিক হেজিটেশন? ভুল পথই যদি হবে তবে ওদের সাহায্য করবো কেন? সে কি শুধুই মানবিক দয়ালুতার তুষ্টক্ষরণ?)

অনুপম ভাবলেন— ঠিক তা নয়। রাজনৈতিক সহানুভূতি তাঁর ছিল বৈকি ওদের দিকে। তিনি মূল লক্ষ্যের দিকে চেয়ে পন্থাটা মেনে নিয়েছিলেন। বিপ্লবে কেন, জীবনেও total non-violence বলে তো কিছু সম্ভব নয়। Necessary violence আর unnecessary

violence এই দুটো দু' জাতীয় ব্যাপার। না, শুধুই মমত্ব নয়, নৈতিক বিশ্বাসও তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো।

(সুধা বললো : ছিলো ? এখন আর নেই ? তা সেদিন যদি ছিলোই তবে কেন চুপ করে রইলেন, সোমশংকর দত্তরায় যখন বললেন—আমরা তো ইহা নিশ্চিতই অবগত আছি যে ইহা ভবদীয় রাজনৈতিক বিশ্বাস নহে, হতভাগ্য ছাত্রদিগের প্রতি উদার করুণা-মাত্র ? তখন কেন রুখে দাঁড়ান নি ? অমনি কুনো অনুপম জুড়ে দিলো : সত্য কথা বলার সাহসের নাম সৎসাহস। তুমি সেটাকেই ভেবেছিলে দুঃসাহস। তাই বলো নি। না ? অনুপম, মনে আছে, পিটার···ইত্যাদি ? সুধা বললো : আপনি আসলে শক্তের ভক্ত !)

আঃ সুধা, তুমি চুপ করো তো। তুমি বড্‌ডো বকবক করো। তোমার বড্‌ডো দুঃসাহস। তোমার মুখ, বুক কোথাও কিছু আড়াল নেই। এই আড়ালটারই নাম সভ্যতা, সুধা। সবটাই যদি বুক-পেট খুলে দেখিয়ে দিলুম, তবে আমরা পোশাক পরি কেন ? দেহে যেমন, বাক্যেও তেমনি,— এমন কি মনের মধ্যেও ঠিক তেমনিই আড়াল দরকার আমাদের।

শূন্য গ্লাসটি হাতে নিয়ে আবার পুনঃপূর্তির ইচ্ছায় টেবিলের দিকে গেলেন অনুপম। টাইপরাইটারের পাশে পড়ে রয়েছে ইউ এন অয়েল সাব-কমিটির জন্য রিপোর্ট। আজ ওটা শেষ করে ফেলতেই হবে। গ্লাস ভরে নিয়ে টাইপরাইটারেই বসে পড়লেন অনুপম। যতো আজে বাজে চিন্তায় মাথাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে— তার চেয়ে মনটাকে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত চিন্তার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।

বসবামাত্র ফোন এলো। ফের ওঠো। কি ভাগ্যি আজ কোনো অতিথি আসেন নি এখনও। ফোন করে কয়েকবার 'হ্যালো' বললেন। বৃথা বাক্য। ওদিক থেকে স্পষ্ট শুনলেন নিরু বলছে—'দাদা ? দাদা ?'

এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অনুপম বললেন—'নিরু?' নিরু শুনলো না। হঠাৎ বিষম বিরক্ত হয়ে ফোনটা শব্দ করে নামিয়ে রেখে দিলেন অনুপম রায়। রাখা মাত্রই আবার বাজতে লাগলো। এবার রিসিভারটা তুলে পাশে নামিয়ে রাখলেন। যাক— এবার সব ডাকা-ডাকি বন্ধ।

ডাক্তার রায়চৌধুরীর সঙ্গে আজই এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা উচিত। ওঁর লম্বা ওয়েটিং-লিস্ট থাকে। যদি সেকেণ্ড ওপিনিয়ন একটা নিতেই হয়, তবে দেরি না করাই ভালো। অযথা শরীর নিয়ে এতো ভাবতেও ভালো লাগে না। দূর। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের করেই থাকে। ভাগ্যগুণে অনুপমের স্বাস্থ্য এতদিন ছিলো নিটোল, এবার একটু-আধটু টোল যে পড়বে, আশ্চর্য কি! মধ্যচল্লিশ তো হোলো।

আচমকা বিস্মিত হলেন অনুপম রায়। মধ্যচল্লিশ? মানে—? পঁয়তাল্লিশ? এত? মারা যাবার সময়ে বাবার বয়স হয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ বছর। কিন্তু বাবা, অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য রায় তো তাঁর মতো এমন যুবক ছিলেন না? তিনি তো চিরটা কালই ছিলেন গতযৌবন, ধর্মসর্বস্ব এক বৃদ্ধ। যদিচ তাঁর যৌবন-পীড়ার পরিচয় কিশোর বয়সেই অনুপম অবগত হয়েছিলেন। তাই যেদিন বাঁধা বয়ানের টেলিগ্রামে দুদিনের বাসি হয়ে গিয়ে সংবাদটি লণ্ডনে পেঁছুলো, প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও অনুপম একটা বিচিত্র মুক্তির উল্লাস এবং ইহজগতে পাপীর উচিত শাস্তি বলে একটা ব্যাপার যে সত্যিই আছে, এটা ভেবে প্রগাঢ় তৃপ্তিবোধ করেছিলেন। ঠিক হয়েছে।

কিন্তু মা? ঠাকুমা? কোন্ পাপে তাঁদের পতিহারা পুত্রহারা হতে হলো? কোন্ কর্মফলে? হ্যাঁ। তাঁদেরও পাপ ছিলো বই কি। লণ্ডনের সেই বৃষ্টি-স্যাঁতসেঁতে, ঝিম্-ধরানো অন্ধকার দ্বিপ্রহরে খুব ঠাণ্ডা মাথায় অনুপম প্রত্যেককে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। শব্দগুলো পাপ-পুণ্য ইত্যাদি হলেও অনুপমের মধ্যে কাজ করেছিলো সনাতন ধর্মবিশ্বাস

নয়, মৌলিক ধর্ম-অধর্মজ্ঞান। মানবত্তাবোধের মাপকাঠি দিয়েই তিনি তাঁর গুরুজনদের দোষগুণ বিচার করেছিলেন। হ্যাঁ। মায়ের অপরাধ ছিলো। অপরাধ ঠাকুমারও ছিলো। অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ। তার জন্যও কোর্টে শাস্তি পেতে হয়। বেলারাণী আর চারুহাসিনীর অমোঘ পাওনা ছিলো সেই শোক। মহাপাপের দণ্ড, মহাশোক।

কৃষ্ণচৈতন্যের বয়স যখন বাইশ, তখন অনুপম রায়ের জন্ম হয়। অনুপমের বয়স যখন তেইশ, কৃষ্ণচৈতন্যের তখন মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচৈতন্যের বিষয়ে কেবল একটিই মাত্র বিস্ময় আছে অনুপমের মনে—একটিই মাত্র রহস্য। যে বাড়িতে প্রতিটি সন্তানের নাম গৃহদেবতার নাম দিয়ে শুরু—সেখানে কৃষ্ণচৈতন্য ঐতিহ্য ভেঙে তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন—অনুপম। অবশ্য, কৃষ্ণের স্পর্শ-বঞ্চিত করে নয়। অনুপমকৃষ্ণ। তারই সঙ্গে মিলিয়ে নিরুর নাম হয়েছিলো—নিরুপমকৃষ্ণ। কলেজে ঢুকেই অনুপম কৃষ্ণকে কেটে বাদ দিলেন। নথিপত্রে কেবল একটি বিদেশী অক্ষর 'কে' তার অন্তর্নিহিত কৃষ্ণনামের সংকেত বহন করে চলেছে—একটি গহন আদিম প্রাথমিক প্রশ্নের মতো, অনুপম কে. রায়।

কৃষ্ণচৈতন্য তো ঠাকুরঘরেই মত্ত থাকতেন—নিত্য-নামকীর্তন, নিত্য-গীতাপাঠ, তার ওপরে ঠাকুমার ব্রতের পরে ব্রত—আজ চাতুর্মাস্য, কাল ঝুলন, পরশু গুরুপূর্ণিমা—লেগেই আছে। জ্যাঠামশাই কৃষ্ণগোবিন্দ তখন প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছেন—তাঁর তুল্য ক্রিমিনাল ল'ইয়ার বেশি ছিলো না কলকাতাতে। রায়বাড়ির বৈষ্ণব রক্তে এতো দাপট কোত্থেকে এসেছিলো কে জানে। যার কল্যাণে জ্যাঠামশায়ের অফিস-ঘরে, রায়বাড়ির নিরামিষ ভিটেয় দুর্দান্ত খুনে-গুণ্ডাদের পদধূলি অফুরন্ত ছিলো। সেই যুগেই জ্যাঠা-

মশায়ের ফী ছিলো হাজার টাকা, আর তিনটি ছেলের নাম তিনি রেখেছিলেন গোবিন্দবিজয়, মাধববিজয়, কেশববিজয়। জ্যাঠামশায়ের রোজগার ছিলো ছ'হাতে আর ওড়ানো ছিলো চার হাতে। তাঁকে ভুলেও কেউ আদর্শ বৈষ্ণব বলে ভাবে নি। একমাত্র ঠাকুমার কোনো ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ছাড়া ঠাকুর-দালানে তাঁকে দেখা যেতো না।

ঠিক তাঁর উলটো জ্যাঠাইমা। আচার-বিচারের শেষ নেই তাঁর। এখন বৈধব্যের ফলে শুচিবায়ু আরও বেড়েছে, আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে রোগ। এবং ক্রোধ। কী দুর্মুখ, কী দুঃসহ রসনার জ্বালা। আর তাঁর সমস্ত বিদ্বেষের লক্ষ্যস্থল মাত্র একটাই—জ্যাঠাইমার ভালোমানুষ স্বামীটির ওপর স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার চাপিয়ে দিয়ে সেই নিষ্কর্মা দিন-রাত্তির পুজোর নাম করে ঠাকুরবাড়িতে শুয়ে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছেন; তাও যদি সত্যি সত্যি ঠাকুরঘরেই মনটা তার থাকতো। তার মন যে কোথায়, তা তো কাক-চিলটাও জানে। আর অনুপমের মা? তাঁরও দোষের শেষ নেই। একেই তো ভণ্ড, অলস দুশ্চরিত্র স্বামীর স্ত্রী, তা ছাড়া তিনি সেই স্বামীকেই প্রশ্রয় দেন এবং নিরলস পরিশ্রমী পরোপকারী অন্নদাতা ভাসুরঠাকুরের প্রতি তাঁর চিত্তে যথোচিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই! জোর করে সেই কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেওয়ার জন্যই জ্যাঠাইমার প্রাত্যহিক উদ্দাম সংগ্রাম।

অথচ অনুপম পরে জেনেছেন যে গৃহে অনুপমের পিতামাতা অবাঞ্ছিত আশ্রিতের মতো অসম্মানে বাস করেছেন, সে গৃহের তাঁরা ছিলেন সমান অংশীদার—যে অন্নে অনুপম ও নিরুপম মানুষ, সেই অন্নে তাঁদের ছিল সহজাত অধিকার। দেবত্র সম্পত্তি ভোগ করেছেন দুই ভাই, সংসার চলেছে সেই উপার্জনে। জ্যাঠামশায়ের রোজগার কিছু উড়ে গেছে বহির্বিশ্বে, কিছু জমা পড়েছে ব্যাংকে, আর

জ্যাঠাইমার হাতে-গলায়, বাকিটা তাঁর তিন ছেলে, সাত মেয়ের শিক্ষা ও বিবাহ বাবদে। অথচ সব জেনেও মা-বাবা কোনোদিন জ্যাঠাইমার অপমান বা অত্যাচারের বিরোধিতা করেন নি। বাবা না হয় মেরুদণ্ড-হীন মুখোশপরা ভণ্ড ছিলেন—কিন্তু মা? আজও মা কেন বিদ্রোহ করেন না? এ কেমন প্রশ্নহীন আনুগত্য? এ যে কুকুরের প্রভু-ভক্তিকেও লজ্জা পাইয়ে দেয়!

অনুপমের সন্দেহ নেই মায়ের এই শান্তিহীন সংসার জীবনের জন্য দায়ী সেই ভণ্ড বৈষ্ণব কৃষ্ণচৈতন্য রায়। তাঁরই দোষে বেলারাণী চিরটা কাল ক্ষেমদাসুন্দরীর কাছে চোর হয়ে রইলেন।

মোটামুটি লোকচরিত্রে তাঁর জ্ঞান আছে আশৈশব—এ নিয়ে মনে মনে যে একটু গর্বও নেই তা নয়। এই মূলধনের ওপরে নির্ভর করেই অনুপম রায়ের জীবনটা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। খুব একটা ঠকতে হয়নি কখনও। যেটা ঠিক যেমন ভাবে ঘটাতে তিনি চেয়েছেন, অনুপম রায়ের জীবনে সেটা ঠিক সেই ভাবেই ঘটে এসেছে চিরদিন। মারিয়ার সরে দাঁড়ানো থেকে সুধার হায়দ্রাবাদ চলে যাওয়া পর্যন্ত।

কেবল এই সমীরের ব্যাপারটাতেই যা অন্যরকম হয়ে গেল। আর অন্যরকম ঘটতে চলেছিলো সুধার বেলায়, কিন্তু সময়মতো সামলে গিয়েছেন। ভাগ্যে বুদ্ধিটা ছিলো।

বুদ্ধিমান লোকের ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। অনুপম মনে করেন, কৃষ্ণচৈতন্য যদি কৃষ্ণগোবিন্দের মতো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হতেন, তবে তাঁরও ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকতো না। হ্যাঁ, জ্যাঠামশাইকে অনুপম শ্রদ্ধা করেন। তিনিও ছিলেন বুদ্ধিনির্ভর জীবনকুশলী। স্ববলেই জয়ী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, তাই বার্ধক্য কি জরাও তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে পারেনি। বয়সের কারণে আদালতে বুদ্ধির খেলা যখন ফুরিয়ে

গেলো, তখনও জ্যাঠামশাই ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পুজোর খেলায় মাতেন নি।

অথচ কৃষ্ণচৈতন্য? জ্ঞান হয়ে ইস্তক, যতোদূর পর্যন্ত স্মৃতির দূরবীণ দিয়ে দৃষ্টি পৌঁছয়—অনুপম দেখেন, চন্দনলেপা চওড়া কপাল····

সেই গলা-গলা বরফ মেশানো ঝুপঝুপে বৃষ্টিতে শনশন শত্রুতার বাতাস তখন চামড়ায় হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছিলো, আর সেই ছুঁচগুলো যেন করাত হয়ে দেহের হাড়-মাংস ফালা ফালা করে ফেলছিলো। হাটের ভিড়েও যে বাতাস শ্মশানের মতো নিঃসঙ্গ করে দেয় মানুষকে, সেই বাতাসের মুখে ঝাপসা লণ্ডনের জানুয়ারির ধূসর ধোঁয়াটে অন্ধকার দুপুরে, পিতার মৃত্যুর সংবাদ টেলিগ্রামে পেয়ে অনুপম রায় তাঁর বন্ধুদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, নোংরা বরফ-গলা কাদা প্যাচপেচে রাস্তা মাড়িয়ে, দামী জুতোটা বাঁচাতে বুটের ওপরে গলোশ চড়িয়ে। পাব্‌গুলি তখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। ছ'টার আগে খুলবে না। বন্ধুদের নিয়ে বোতল ঘিরে বসেছিলেন জো ওয়াল্টার্সের আট-বাই-বারো ফুট ঘরে, তাঁরা চারজনে। সেলিব্রেশন? কিসের? জিজ্ঞেস করেছিলো, জো, কেনেথ, জেফরি। অনুপম বলেছিলেন—একটা সুখবর এসেছে বাড়ী থেকে। ফ্যামিলি একটা শক্ত মামলায় জিতে গেছে। সেলিব্রেশন চলেছিলো গভীর রাত্রি অবধি। সন্ধ্যে ছ'টার পরে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সোহো স্কোয়ারের দিকে পাব্‌ক্র্যলিং-এ। একটার পরে একটা পাবে ঘুরেছিলেন, এগারোটায় পাবগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পরে আলো ঝলমলে নাইট ক্লাবগুলোর শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন নারীদেহের ফোটোতেই গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রাণ ভরে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন চার বন্ধুতে।

॥ ১৭ ॥

'রয়'কে নিয়ে সেই রাত্রে মারিয়া খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। দু'বছর কেটে গেছে, মারিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। তখনই অনুপমের মনের মধ্যে উদ্বেগ হয়ে নিয়ত বিদ্ধ হচ্ছে মারিয়ার যত্ন। মারিয়ার 'রয়'। মারিয়া বলতো, 'অ্যানুপ্যাম—তোমার নামটা যেভাবেই ছোট করি না কেন মেয়েদের নাম হয়ে যায়, এ্যান, নয়তো প্যাম। তার চেয়ে 'রয়' ঢের ভালো। পুরুষমানুষের নাম।'

মদে-মাংসে পিতৃবিয়োগ উদ্‌যাপন করে এসে, রাত্রি যখন গভীরতর, নিঃসঙ্গতা যখন গাঢ়তর, মারিয়ার ভারী নরম উষ্ণ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলেন সেদিন অনুপম। না, কৃষ্ণচৈতন্যের জন্য নয়, ফুলকাকীকে মনে পড়ে গিয়েছিল। মারিয়ার বুকে কেমন একটা গন্ধ ছিলো সেদিন, মারিয়ার আঙুলে কিসের একটা স্পর্শ ছিলো সেদিন—সেই টেলিগ্রামটা পড়বার পর থেকেই মারিয়া যেন ফুলকাকী হয়ে গিয়েছিলো। সেই ফুলকাকীর বুকে, ছোট্টো অনু হয়ে ফুলকাকীরই জন্যে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ইহুদীকন্যা মারিয়া এপ্‌স্টাইনের শয্যায় নেশার ঘুমে লুটিয়ে পড়েছিলো সদ্য স্বর্গত কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের অশৌচাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুপমকৃষ্ণ রায়।

পঁয়তাল্লিশ বছর—এই একটা কথা থেকে কতো কথা ভেসে এলো। না, টাইপরাইটারের সামনে নয়, এসব কথা এখানে নয়। মন ফেরাও, অনুপম।

'ফুলকাকী'। শব্দটি স্মরণে উত্থাপিত হলেই স্নায়ুতন্ত্রীর মূলে

সজোরে ঘা পড়ে, গভীর গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ভরে যায় অভ্যন্তর।

পরন্তু, মারিয়া।

'মারিয়া' এই নাম অনুপমের অন্ত্রের মধ্যে একটা যান্ত্রিক অস্বস্তি, একটা স্নায়বিক আলোড়ন আরম্ভ করে দেয়।

কিন্তু অনুপম। শান্ত হও।

টাইপরাইটারের ঘোমটা সরিয়ে ফেলেছেন অনেকক্ষণ—সাদা কাগজের কুমারী শূন্যতার দিকে চেয়ে অনুপম মনের রাশ টেনে ধরলেন। আরেকবার হিসেব করলেন আর দু-তিনদিনের মধ্যে ডাকে না দিলে লেখাটা স্টেন্‌সিল করিয়ে বিলি করার সময় হবে না কনফারেন্স আরম্ভের আগে।

দিল্লিতে যে মিটিং আছে ও মাসের প্রথম সপ্তাহে—গলার অবস্থা এই রকম থাকলে সেখানেও যাওয়াটা বৃথা হবে। অথচ ওই মিটিংয়ের জন্যই তিনি জেনিভায় যাচ্ছেন না। সাগরপারের হাওয়া খাওয়ার মোহ অনেককালই কেটে গেছে অনুপম রায়ের। বরং বেশ বিরক্তই লাগে নিত্য-নিত্য এই 'পি' ফর্ম-পাসপোর্ট-ভিসা কাস্টমসের কালক্ষয়ী জটিল চক্রে পা দিতে। অথচ পা তাঁকে দিতেই হয়। কাজের ফাঁদে ধরা একবার পড়লে আর তো মুক্তি নেই। অনুপমের মনে পড়লো, মার্কিন দেশে এর নাম র‍্যাটরেস, ধাড়ি ইঁদুরের দৌড়। তাঁর একটুও ভাবতে ভালো লাগলো না যে, তিনি এই বিশ্বজোড়া ইঁদুর-দৌড়ের একটি ছুটন্ত ধেড়ে ইঁদুর। ফাঁদে পা দিয়েছেন, এখন তো না দৌড়ে তাঁর ছুটি নেই। 'পাবলিশ্‌ অর পেরিশ'—এই স্লোগান মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কড়া চাবুক হাঁকড়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় লাইব্রেরিতে-লেবরেটরিতে-আর্কাইভ্‌সে। বনে-বাদাড়ে ফীল্ড-ওয়র্ক

করায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নিস্তরঙ্গ, বুজে আসা বিদ্যাধরী অধ্যাপক-দের রেখেছে কর্মহীন অখণ্ড অবসরে, অনুচ্চ আকাঙ্খার নিরুদ্বেগ বিশ্রামে। মুখে পানজর্দা ও রাজাউজির, নাকে নস্যি এবং উন্নাসিকতা, আর দৃষ্টিতে পরশ্রীকাতরতা—এই নিয়ে তাঁদের নির্ভার দিনযাপন। এরই মধ্যে কখনো-সখনো পুরস্কারের লোভ বা অর্থলোভ কারুর কারুর ঘাড় ধরে বইটই লিখিয়ে নেয়।

কিন্তু অনুপম জানেন, অনুপমের সমস্যাটা আলাদা। তাঁর সহজে মুক্তি নেই। তাঁর তাগিদ উঠে আসে তাঁর নিজেরই ভেতর থেকে। না লিখে শান্তি নেই তাঁর। অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়, এই প্রতিযোগিতা তাঁর নিজেরই অতীতের সঙ্গে তাঁর নিজের ভবিষ্যতের। চির-মধ্যদিনের উর্ণজালে বেঁধে রাখতে হবে খ্যাতির সূর্যকে। অস্তে নামতে দেওয়া অসম্ভব। স্বধর্মে স্থিত থাকতে চাইলে ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে।

নাঃ, এভাবে পারা যায় না। আজ হবে না।—এক লাইন লিখতে পারেননি এখনও পর্যন্ত। টাইপরাইটার থেকে উঠে ফের আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন অনুপম রায়। আজ কাজ এগোবে না। বিস্মৃত হুইস্কির গ্লাস টেবিলেই পড়ে রইলো, আধো-ভরা। গলায় হাত দিয়ে অনুপম স্বরযন্ত্রের অবস্থিতি অনুভব করতে চেষ্টা করছেন। স্বরনালীর নড়াচড়া। না। ওসব কথা নয়। ওদের কথা নয়। অন্য কথা ভাবো। নিজের কথা। য়ু কান্ট অ্যাফোর্ড টু লুজ য়োর ভয়েস। প্রকৃতির মৌল ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে বাক্‌যন্ত্রটিই বোধ হয় সবচেয়ে জরুরি। 'বাচমেব প্রথমা'। সপ্তর্ষির পাশে—'বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা'—শব্দ ব্রহ্ম উচ্চারণকারিণী বাক্‌ই অষ্টমী ঋষি।—সেই বাক্‌শক্তি রহিত হতে চলেছে। তুমি, অনুপম। একবার কি ভেবো দেখেছো, ব্যাপারটা ঠিক কী জাতের সমস্যা?

—'দাদাবাবু?'

—'ফিরে এলি ?'—নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই আরো একবার ধাক্কা খেলেন অনুপম।

—'দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়। এ সপ্তাহে হয়তো বেরুবে না। দিল্লি বোম্বাইতে এখন আর পাঠানোর সময় নেই, না কী সব যেন বলাবলি করছিলেন। আমি অবশ্য ঠিক বুঝতে পারলাম না সবটা—কফি করে দিই ?'

অনুপম ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। গ্লাসের হুইস্কির কথা মনে পড়ে না।

—'দাদাবাবু, একবার ছোড়দাকে টেলিফোন করলে হত না? আপনার শরীরটা কিন্তু একদম ভালো নেই।'

—'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।'

—'ওরে বাবা, আপনি তো ফোন করতে পারবেনই না। আপনি মানা করবেন না দাদাবাবু, একটু কিন্তু ছোড়দাকে ডাকছি আমি। আজকেই ছোড়দা বরং ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।'

—'আহ্।' ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দেন তিনি। নীরবে। আসুক নিরু। চিকিৎসক আসুক। কেষ্ট, তোর ভালো হোক।

—'রাত্রে একটু ঝোলভাত খাবেন তো? মা গলা ভাতের ব্যবস্থা করে গেছেন। গিলতে কষ্ট হবে না। একটু নুন জল এনেছি। পারবেন, উঠে গার্গেল করতে? জ্বরটর হয়নি তো?'

হ্যাঁ, পারবেন। ঘাড় নেড়ে জানালেন অনুপম। জ্বর হয়নি।

—'উঠুন তবে। জুড়িয়ে যাবে জলটা।' অনুপম সোজা হয়ে বসেন। নুন জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে কেষ্ট বলে—

—'দাদাবাবু? এই বলছিলাম কি, মানে, ওই সমীরদা তো আর এলেন না। কোনো খবর....'

মুহূর্তেই মুখের ভেতরে উষ্ণ শুশ্রূষার স্বাদ তিক্তশীতল হয়ে যায়।

জলটা প্রথমে থু করে বেসিনে ফেলে দিলেন। তারপর পরিশীলিত মৃদু হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত হল। অভিজাত ঘাড় আশ্বাসের ভঙ্গিতে দোলালেন। নুন-জলের গ্লাসশুদ্ধ দক্ষিণ হস্তটি অভয়মুদ্রার নকলে একটু উর্ধ্বে উঠে স্থগিত রইলো। বাঁ হাতে বেসিনের কিনারা খামচে ধরে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রাণপণ চেষ্টায় একটিই শব্দ উচ্চারণ করলেন—

—'ভালো…'

তারপরেই ঠা-শ্ এই শব্দ করে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল—কেষ্টর মুখের ওপরে।

॥ ১৮ ॥

সকাল আটটার মধ্যেই নিরুপম তার ঝড়ঝড়ে মরিস এইটে চড়ে এসে পড়লো। মাকে শুদ্ধ নিয়ে। কেষ্ট কাগজ পেন্সিল যুগিয়ে দিয়েছে হাতে হাতে। ডাক্তার রায়চৌধুরীর সঙ্গে ইমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হলো আজই।

ডাঃ রায়চৌধুরী তাই-ই বললেন, ঠিক যা যা ডাঃ ব্যানার্জী বলেছিলেন। কেবল তিনি আরো বললেন, ভিয়েনা গিয়ে অপারেশনটা করানো অত্যাবশ্যক। গেলেও হয়, না গেলেও হয়, এমন নয়।

নিরু ডাক্তারকে বললো—'নিশ্চয়ই যাবে।' একমুখ হেসে দাদাকে বললো—'কিছু ভেবো না দাদা, ভিয়েনা গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সারা রাত্রি বিশ্রামের পর আজ অনুপমের আবার স্বর ফুটেছে। আজ মনে পড়েছে ডাঃ রায়চৌধুরীর নিষেধ ভুলে গিয়ে কালকে কুড়িটা সিগারেট……পুরোপুরি কণ্ঠরোধের কারণটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ধূমপান আর নয়। না। কদাচ নয়। পৃথিবীর রমেনরা যাই করুক। যাই বলুক। 'সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশঃ'

—কাল এক অতি সম্মোহিত দুঃসময় অতিবাহিত হয়েছে তোমার, অনুপম। সবগুলি অশ্বের রজ্জু নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নাও। রথ যেন পথভ্রষ্ট আর না হয়।

মাকে নিরুর সঙ্গে আজ দর্জিপাড়ায় চলে যেতেই হলো, নিরুর ছেলের পরীক্ষা চলছে। আজকাল পরীক্ষা দেওয়াটা, শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষায় বসতে পারাই একটা আলাদা পরীক্ষা। প্যাকেটভর্তি ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল, ক্যাপসুলের শিশি—সব সমেত নিরু দাদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল—পথে মোড়ের ডিসপেনসরিতে থেমে কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নিয়মিত ইঞ্জেকশন দিয়ে আসার কথাটাও বলে নিল। নিরুও অনুপমের মতোই গোছানো, তবে ওদের জগৎ-সংসারটা আলাদা। যাবার আগে মা বারবার কেষ্টকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন—'একটা ভাল শেলেট পেনসিল সঙ্গে সঙ্গে রাখো বাবা, অনু যেন কারুর সঙ্গে একটাও কথা না বলে। ফোনে খবদ্দার ডেকে দিও না ওকে। আমি এসে থাকবো শুক্কুবার থেকে, খোকার এগ্‌জামিনটা শেষ হোক। ততদিন, দেখিস বাছা কেষ্ট, আমার অনু যেন একটাও কথা বলে না।'

অনুপম এমনিতেই স্বল্পভাষী। কথা না-বলাটা তাঁর কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়। বাড়িতে ফিরেই টেবিলে চিঠির গোছা।

বুক ফেয়ারের উদ্বোধন। ছাত্রীর বিবাহ। মার্কিন লোকসঙ্গীতের আসর। ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রবীণ ইংরেজ লেখকের বক্তৃতা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামনের বছরে একটি বক্তৃতামালা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ। ওসমানিয়া? হায়দ্রাবাদ! না, ওখানে নয়। সুধার দিকে নয়। শ্রীনগরে পুজোর ছুটিতে জার্নালিজমের

ছাত্রছাত্রীদের যে পক্ষকালব্যাপী সর্বভারতীয় ট্রেনিং ক্যাম্প হচ্ছে তাতে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বক্তৃতা? কেবলই বক্তৃতার ডাক!

বক্তৃতা দেবেন যে, গলা? বাঁ হাত আপনি উঠে এলো গলায়, আলতো মুঠোর আদরে আত্মসমর্পণ করলো গলা। বক্তৃতার নিমন্ত্রণ-গুলোর কি হবে এবার?

সবুজ খামটা খুললেন না। মেনকার চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ঝুড়িতে। বাদামী রঙের রঙিন খাম এখন আর আসবে না। হয়তো ছ'মাস বাদে। আবার যখন তার খেয়াল হবে, খুশি হবে। ছ'পাতা পুরোনো দিনপঞ্জির টুকরো পাঠিয়ে দেব। কিংবা হয়তো—ভাবতে গিয়ে কি অনুপম রায়ের চোখের পল্লব সামান্য কেঁপে গেল, কে জানে, হয়তো আর ইচ্ছেই করবে না সে মেয়ের। যা খেয়ালী।

আপাতত ভাবনা চিঠি-চাপাটি নিয়ে নয়। এখন ভাবনা: শব্দ। শব্দ পুনরুদ্ধার। যদি আর কণ্ঠস্বর নিঃসৃত না হয়? যদি?

এই যে এতশত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, এত আদর, এত আপ্যায়ন, জগৎজুড়ে লোক-লৌকিকতা, জীবন জুড়ে প্রেম-প্রণয়ের বন্যা—এর কতটুকু টিঁকবে যদি তাঁর স্বর লুপ্ত হয়ে যায়?

নিয়মিত রেডিওতে তাঁর স্বরটি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেশবাসীর কান—সপ্তাহের সবচেয়ে জরুরী বিশ্বরাজনীতির ঘটনা নিয়ে পরিশীলিত টিপ্পনী ন্যাশনাল প্রোগ্রাম হিসেবে 'রয়জ করনার' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটা নতুন, বছর দুয়েক চালু হয়েছে। সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সব বাঙ্গালোর-মাইসোর-চণ্ডীগড়-চিতোরগড়ের খেল্ খতম হবে।

প্রাহায় যাবো, না, জাকার্তায়—এই জাতীয় যতো 'কঠিন' সমস্যা, সব জন্মের মতো মিটে যাবে। মন্দ কি?

বাকি চিঠিগুলো একধারে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অনুপম হঠাৎই উঠে পড়লেন। বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকানি দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। ভালো করে দেখতে চাইলেন আলো-আঁধারিতে অস্ফুট নিজের মুখ। দেখা কি যায়? এই দিনের বেলাতেও এ ঘরে জমে আছে সন্ধ্যার নির্জন আঁধার। নির্জনতাটা কাম্য, কিন্তু অন্ধকার কাম্য নয় কোনো অবস্থাতেই।

আলোটা জ্বাললেন। তবুও আরশি যেন ঝাপসা। শুকনো তোয়ালের কোণ দিয়ে যত্ন করে ঘষে ঘষে মুছলেন। চুম্বনের ভঙ্গিতে ঠোঁট ফাঁক করে স্বীয় প্রতিবিম্বের দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন, মুখনিঃসৃত বাষ্প ছড়িয়ে দিলেন আরশির কাচে, স্বস্পৃষ্ট কুয়াশায় মুহূর্তে ঢেকে গেলো অনুপম রায়ের মুখের ছায়া। আবার মুছলেন। অতি যত্নে। তোয়ালের অন্য কোণ দিয়ে। যেন মস্‌লিনের রুমালে মুছিয়ে নিচ্ছেন কোনো বাদশাজাদীর প্রণয়ক্লান্তি। এবারে বেশ স্পষ্ট ফুটেছে। অন্তত, এর চেয়ে বেশি আর হবে না।

বেসিনে দুই হাতের ভর দিয়ে জিমন্যাস্টিকের ধাঁচে আরশির যথাসম্ভব নিকটবর্তী হলেন। কাচের গায়ে ফুটলো একটি মধ্যবয়স্ক, পরিশ্রান্ত, উদ্বিগ্ন মুখ। কপালে দুশ্চিন্তার ত্রিবলিচিহ্ন। মোটা শেল্ ফ্রেমের বাঁধানো দুটি পুরু কাঁচের চোখ, যেন অক্টোপাসের চক্ষুর মতো অতিকায়, অত্যুজ্জ্বল। সাপের মতো তীব্র। ভুরু দুটো অসমান। অনুপমের তো সুপুরুষ বলে খ্যাতি আছে। সুপুরুষ? কিসের সুবাদে? চশমাটা খুলে হাতে নিলেন।—চোখ দুটো সুদূরে উধাও হলো, আরশিতে প্রতিবিম্বও ফেরারী।

পকেট থেকে রুমাল বের করে এবার চশমার কাচ দুটি ঘষলেন। মুছে আবার চোখে দিলেন। আবার সেই গিলে খেতে আসা দৃষ্টির সামনাসামনি।

সুপুরুষ? কিসের সুবাদে? রং? শ্যামলা। কালোর দিকেই বরং বলা যায়। গড়ন? মাঝারি। লম্বাটে গড়ন বটে, কিন্তু তিনি কিছু শালপ্রাংশু নন। বরং এই সুপুরি গাছটাছের মতো। আসলে সামঞ্জস্যটাই সব। যেমন তাঁর স্বভাবে, তেমনি তাঁর শরীরেও একটা সুভগ সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ শরীরের উর্ধ্বভাগের তুলনায় তাঁর নিম্নভাগটি অনেকটা বেশি লম্বা, তাই প্রকৃত দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাঁকে দীর্ঘতর দেখায়। স্বভাবের ব্যাপারটাও কি অনেকটা সেই রকমই? দৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘতর দেখায় কি অনুপম রায়কে? ভাবতে ভাবতেই শার্টটা খুলে ফেললেন। বাথরুমের চৌকো আয়নায় কেবল বুকের আধখানা পর্যন্ত ধরা পড়ে, সবটা নয়। হাতকাটা গেঞ্জির নিচে লোমশ বুকের ইঙ্গিত, ফুটে আছে অহংকারী কাঁধ, সমর্থ বাহু। সরকারী হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের ছাপমারা, অ্যাপ্রুভড, স্বাস্থ্যকর মাংস।—না, লোভনীয়তার কিছুমাত্র অভাব নেই। মননের কোনোই ছাপ নেই গলার নিম্নবর্তী এই ফুটো গেঞ্জিতে প্রস্ফুটিত জৈবতায়। ক্লান্তি, অথবা উদ্বেগ নেই। শুধু দ্বন্দ্বহীন সামর্থ্য।

এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখটাকে নিরীক্ষণে মন দিলেন। লম্বাটে মুখ। চিবুক ছুঁচলো। নাকটি মোটা, ত্রিকোণ, চওড়া, মাংসল। যেন একটি সিঙাড়া বসানো আছে মুখের মাঝখানে। নাকের দু পাশ থেকে ভাঁজ নেমে এসেছে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত। গোঁফ নাচিয়ে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করলেন, ভাঁজ গভীর হলো। দাঁতে দাঁত টিপে—মাজনের বিজ্ঞাপনের ঢঙে—দাঁতগুলি খুঁটিয়ে দেখলেন, ঠোঁটের পর্দা যথাসাধ্য সরিয়ে দিয়ে। হলদেটে, অসমান। বাঁ দিকের শ্বদন্তটি চোদ্দ বছর বয়সে সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়েছিলো, সেই থেকে ওঁর সহজ হাসি বন্ধ। হাঁ করে দেখলেন। দাঁতের পিছনে বাদামী নিকোটিনের ছোপ। জিভটা উলটে দেখলেন। বাক্‌স্বরূপা। বাগযন্ত্র। জিভের তলার রং নীল। শিরা ওঠাওঠা। গরুর জিভ এরকম নীল

হয়। রায়বাড়ির পিছনের উঠোনে গোয়াল ছিলো—সেখানে অনেকটা সময় কাটাতো নিরু, গরুদের ঘাস-পাতা খাইয়ে। অনু বলে একটা ছেলেও সেখানে পেয়ারাগাছে চড়ে চেয়ে থাকতো।

গাল দুটি বসা, কড়া দাড়ির সবুজে ছায়ার মধ্যে বেশ কিছু সাদার ফোঁটা ছিটিয়ে আছে। আশ্চর্য! আজ সকালে ডাক্তার দেখানোর তাড়ায় কি তবে দাড়িটাই কামানো হয় নি? অনুপম। তোমার দৈনন্দিন কাজগুলিতে ভুল শুরু হলো? তুচ্ছ একটা কারণে? চোখ সরু করে চামড়া লক্ষ্য করলেন। চশমার নিচে চোখের কোলে কালি। ব্রণর দাগে, ছোপ ছোপ মেছেতায় মুখের চামড়ায় ক্লান্তি মাখানো। মাথার দিকে চাইলেন—যদিও ভুরুর ওপরে একগুচ্ছ চুল ঝুঁকে আছে, যদিও আয়নায় দেখা যাচ্ছে না, তবু, উনি জানেন, এবার পাৎলা হয়ে আসছে। ব্রাশে রোজ চুল ওঠে। বেশ কিছু তার রূপোলি।

না, বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। ওই অতিকায়, গিলে-খেতে-আসা তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া। ওই চোখ তো কাছে টানে না, কেবলই দূরে ঠেলে দেয়।

কী ভেবে চিবুকের তলার চামড়াটা তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে টেনে ধরবার চেষ্টা করলেন। না, ধরা দিলো না, পিছলে গেল। অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। যাক। 'সূর্য অস্ত যায়নি এখনো।'

এবার কিনা বিরোধীপক্ষে অস্ত্র ধরেছেন স্বয়ং প্রকৃতি। অনুপমের জীবনে শান্তি বা শৃঙ্খলা উৎপীড়িত হয় নি কখনো। এতদিন দেখা গেছে—যে কোনো বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকেই বুদ্ধির অস্ত্রে জয় করা যায়। তবে, এও কি সম্ভব নয়? প্রকৃতিকে পরাজিত করাই তো অনুপমের আকৈশোর কর্মসূচী!

এর আগে আগে ছিলো সম্ভোগের প্রশ্ন; কিন্তু এবারে প্রশ্নটা অন্য। বড়ো বেশি প্রাথমিক, বড়ো স্থূল—সোজাসুজি।

একটা ইন্দ্রিয় থাকা-না-থাকার প্রশ্ন এটা।

অনুপম, অগ্রাহ্য করো, তুচ্ছ শরীরকে এতটা সময়, এতটা প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপায়ই বা কি? নিজেকে হঠাৎ ব্রব্‌ডিঙনাগের বিপুল মুষ্টিতে ধৃত ক্ষুদে গালিভারের মতো অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এতকাল এই ষড়রিপুশাসিত জীবনকে পায়ের তলায় রেখে অনুপম রায়ই ছিলেন প্রভুর ভূমিকায়। অকস্মাৎ জৈব প্রকৃতি বিপুল আকার নিয়ে চারি ধার ঢেকে দাঁড়াতে চাইছে। প্রথমেই সে দাবি করেছে তীরন্দাজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, বাগ্মী অনুপম রায়ের কণ্ঠসম্পদ। অনুপমের মনে হলোঃ এখানে বুদ্ধির বর্ম কোন বর্ম নয়। বুদ্ধির অস্ত্র কোনো অস্ত্র নয়। কেন নয়? চেষ্টা করো! ধরো যদি তোমার বাক্‌রোধ ঘটে গেলো, অনুপম, জীবন তো সেখানেই শেষ নয়?

কিন্তু, মানুষের সভ্যতার স্তর বিচার হয় তার ভাষা ব্যবহারের ঔৎকর্ষে। মার্জিত অন্তরের দেখা পাওয়া যায় শব্দনৈপুণ্যের খোলা বারান্দায়।

তুমি তো মন্দিরগাত্রের অক্ষয় ভাস্কর্য নও অনুপম, নও চক্ষুভাষিণী রমা. তুমি তো মাংসপিণ্ডের সুসমঞ্জস সমষ্টিস্বরূপ কোনো মস্তিষ্কহীন চিত্রার্পিত নক্ষত্র নও।

ওই পরিশ্রান্ত, ধূর্ত, নির্বিশেষ প্রৌঢ়ের কী এমন জাদু আছে? ওই বয়স্ক, বিচক্ষণ মুখ যদি ভাষাহীন হয়ে যায়।···

দরিদ্র, অসুন্দর ডক্টর জনসনের কথকতায় মুগ্ধ-বিমোহিত ছিলেন তাঁর সমকালীন ইংলণ্ডের তা-বড় তা-বড় অভিজাত সুন্দরীর গুচ্ছ! অনুপম, কোথায় থাকবে তোমার রুমা-নলিনী-মেনকা-কমলকলি সকল? এইভাবেই কি জ্বলবেন তখনও স্যর রাঘবন, কৃষ্ণমূর্তি, মোহনরাওবৃন্দ তোমার কুলুঙ্গিতে, দেদীপ্যমান? অনুপম, কোথায় পাবে ওই ম্রিয়মান ছাত্রের দল, যারা প্রতি বছর পাশ করে বেরিয়ে

তোমার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে সমাজে? আর সেই অদেখা অনুরাগীরা, শুধু আকাশবাণী মারফৎ তোমার স্বরের গুণেই যারা তোমার বশংবদ? কী দেখেছো তুমি ওই নির্বাক মুখের মধ্যে? কোন্ ইন্দ্রজাল? কী আছে উহার মাঝে, ওর মাঝে?

অনুপম আলোটা নিবিয়ে দিলেন। অর্গলবদ্ধ ঘরের দ্বিপ্রহর কোথায় লুকিয়ে পড়লো। স্থির হয়ে রইলো কেবল অন্ধকার। চুলের মধ্যে দীর্ঘ আঙুল, স্থাণু অনুপম ভাবলেন: নির্বাক জগৎ এই আলোনেবানো ঘরের মতো হবে কি?—বাক্ একটি অগ্নিময় দীপস্বরূপ, মনের ঐশ্বর্যসমূহ লোকসমক্ষে সে-ই প্রস্ফুটিত করে। যেমন এই আলো। আলো ছিলো, আয়নায় তাই চলছিলো সঘন, চঞ্চল ম্যাজিক। আলো নেই, আয়নার ম্যাজিকও ঘুচে গেছে। মুছে গেছে নীল টালি, শাদা বেসিন। অনুপম রায়ের প্রতিচ্ছবি।

বাক্ লোপ যদি হয়, অনুপম রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্বের কতো ভাগ সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে? লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবে?

এই সময়ে, তাঁর চোখের সামনে, গলা পর্যন্ত বালিতে প্রোথিত, জিভ কাটা একটি মানুষের জীবিত মুণ্ড, অসীম রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের মহাশূন্যতায় দৃশ্যমান হোলো। শুধু দুটি অসহায় অক্ষিগোলক মৃত্তিকাবন্দী মুণ্ডের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছে। প্রাণের শেষ চিহ্নস্বরূপ।

অন্ধকার বদ্ধ বাথরুম থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে, প্রকাশ্য দিবালোকে অনুপমের চোখ যেন ঝলসে পুড়ে গেল। অনুপম ভাবলেন:

বাক্—এক অত্যাশ্চর্য সুখ, সম্ভোগ—

বাক্—একটি ইন্দ্রজালবিশেষ—

বাক্—একটি বিশিষ্ট ঐশ্বর্যস্বরূপ—

অথচ—শুধুমাত্র অনায়াসলব্ধ, অনর্জিত বলেই কি এদিকে আমার

নজর পড়েনি এতদিন ? নাকি—হারাবার ভয় ছিলো না বলেই একে ঐশ্বর্য বলে চিনতে পারিনি এতদিন ?

এবং—'বুদ্ধি' ছাড়াও কিছু সহজাত সম্পদ তাহলে আমাদের আছে, প্রকৃতি যার অধিকার ফিরিয়ে নিতে এলে তবেই আমাদের টনক নড়ে ?

অনুপম রায় একবার ভাবলেন—এই সম্পদের জন্য কি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার কথা ছিলো ? কোথাও কি কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে ? তারপরেই মনে হোলো : ভুল ? কিসের ভুল ? কিসের কৃতজ্ঞতা ? কৃতজ্ঞতা শব্দটাই বরং এখানে ভুল। কথাটা আসলে হোলো : শিক্ষা। অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ নেওয়া। একটা নতুন শিক্ষা হোলো মাত্র—এই জীবন বৈচিত্র্যময়।

মাথা ঠাণ্ডা করে অনুপম রায় অয়েল পলিসি সাব-কমিটির কাগজপত্র নিয়ে গুছিয়ে বসলেন। আর সম্মোহ নয়—আর বুদ্ধিনাশ হবে না। এবার কাজ হবে।

॥ ১৯ ॥

নিরু বলেছিলো : 'ভিয়েনা নিয়ে তুমি কিছু ভেবোনা দাদা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একবার বড়মাকে বললেই—'

—'খবরদার নিরু, জ্যাঠাইমাকে বলবে না', বিকৃত কণ্ঠে চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন অনুপম। নিজেই চমকে গিয়েছিলেন নিজের আচরণে। অবাক হলেও ঘাবড়ায় নি নিরু।

—'আমি ধার চাইবার কথা ভাবছিলুম দাদা, বড়মা তো কতো লোককেই টাকা ধার দেন, সুদে। থাকগে বাপু, বলবো না ছাই। আমার আরো ঢের সোর্স আছে।'

ডাঃ রায়চৌধুরী বলছেন, সামনের মাসেই অপারেশনের ব্যবস্থা

হওয়া দরকার। এই অবস্থায় এমন কনস্ট্যাণ্ট ইরিটেশন নিয়ে বেশি দিন থাকাটাও নাকি ভাল নয়। অন্য ধরনের সমস্যার উদয় হতে পারে। কিন্তু এখুনি অতটা টাকা কোথ্ থেকে পাওয়া যাবে? ডাঃ ব্যানার্জি এবং ডাঃ রায়চৌধুরী যোগাযোগ শুরু করতে চান ভিয়েনার ডাক্তারদের সঙ্গে, ডিটেলস খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য।

অনুপম রায় দরিদ্র নন। নিয়মিত বেতনাদি ছাড়া, বই থেকেও তাঁর আয় মন্দ হয় না। কিন্তু সম্প্রতি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন ক্যামাক স্ট্রীটে—সেখানেই আটকা পড়েছে যাবতীয় ক্যাশ—ফ্ল্যাট প্রায় তৈরি শেষ হয়ে এসেছে। এই মূহূর্তে তাই তাঁর হাতে জমা টাকা নেই।

সেই দর্জিপাড়ার রায়বাড়ি থেকে ক্যাম্যাক স্ট্রীটের এই 'ক্যামিলিয়া এ্যাপার্টমেণ্টস'! অনুপম (কে ফর কৃষ্ণ) রায় যেন পেরিয়ে এলেন অন্তবিহীন পথ।

দর্জিপাড়ার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি পরাজিত হয়ে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে ঠাঁই ছেড়ে দিয়েছে উচ্চবিত্ত মানসিকতাকে। এখন রেস্তরাঁয় ঢুকলে আর মেনুর ডানদিকে তাকিয়ে খাদ্য অর্ডার দিতে হয় না। অনেক সময়ে হয়তো খাদ্য অর্ডার দেবার আগে ডানদিকে চাইতে ভুলও হয়ে যায়। এখন ট্যাক্সি মানেই রুদ্ধশ্বাস তাড়া নয়। এখন ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে বন্ধুপত্নীকে চা করতে বলা যায়। কিন্তু একটা অঙ্ক মিলছে না। যতোই উচ্চগ্রামে উঠছে জীবনযাত্রার মান, ততোই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাঁর মার্ক্সিস্ট আদর্শবাদের মানদণ্ড। এটা খুব লজিকাল নয়। অনুপম কিন্তু প্রকৃতই মনেপ্রাণে সাম্যে বিশ্বাসী। কেবল লোক দেখানো বিতণ্ডায় নয়, কেবল কালিকলমের বাগবিস্তারে নয়।

...আলোচনার পরদিনই সন্ধেবেলা হাস্যবদনে কপাটবক্ষ শাল-প্রাংশু দিগ্বিজয়ীর উপযুক্ত পদক্ষেপে নিরুপমের প্রবেশ ঘটলো অনুপমের ফ্ল্যাটে। ঢুকেই হাঁক দিলো—

—'কেষ্ট! আনো দিকি বেশ ভালো করে এক কাপ কফি তৈরি

করে! নাকি দাদা অন্য কিছু দিয়ে সেলিব্রেট করবে? মা তো আজ নেই এ বাড়িতে।···যাক! · হয়ে গেল সব ব্যবস্থা। এবারে কেবল প্যাসেজ বুক করা বাকি। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পারমিশনটা।'

—'হয়ে গেল সব? কী করে করলি? কে দিল? কোথায় ধার নিলি? ব্যাংকে?'

—'তুমি অতো কথা বোলো না। স্লেটটা গেল কোথায়? কেষ্ট? দেবে আবার কে? ছিলই তো। আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটা তোলার জন্য এ্যাপ্লাই করে দিলাম, আর বীথির ইউনিট ট্রাস্ট দুটো বেচবারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অল কমপ্লিট! কেবল ফাইনালাইজ করা বাকি। নো বড়মা, নট কিচ্ছু। অল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, অফিশিয়ালি ডান! কেষ্ট! কফি থাক। সোডাই লাগাও। বরফ আনো। কই, দাদা, বের করো? হয়ে যাক?'

—'নিরু!'—এবার অনুপমের আর্তনাদটা উঠে এলো গলা থেকে নয়, পাঁজরের জালি-ঢাকনার তলায় লুকনো গভীর রক্তাক্ত ইঁদারার ভেতর থেকে।

—'কী করেছিস তুই? নিরু?'

নিরুপমের হাতটা দুই হাতে চেপে ধরেছেন বুঝতে পারা মাত্রই হাতটা ছেড়ে দিলেন অনুপম। রুক্ষস্বরে বললেন—'তুই কি ক্ষেপেছিস?'

—'আ' দাদা। একটাও কথা নয়। স্লেটে লেখো তো। নট আ ওয়র্ড। মনে নেই?'

—'তুই কি ক্ষেপেছিস নিরু? বীথির টাকা!'

—'তুমিই তো ক্ষেপেছো দেখছি। আপদ বিপদের জন্যেই তো মানুষ টাকা তুলে রাখে—বীথির টাকা কি তোমার নয়?'

—'ধর, তোদের যদি হঠাৎ কোন···'

হা হা হাসিতে ছোটো ফ্ল্যাট বিদীর্ণ করে দিয়ে রায়বাড়ির নিরু

বলে ওঠে—'খনা কি সাধে বলেছে যে প্রফেসরদের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না! আরে—আমার কিছু হলে তো তুমিই রয়েছো দাদা!'

—'শোন নিরু, টাকা আছে।'

অনুপম শুনতে পেলেন কার যেন একটা অচেনা কাতর কণ্ঠ, —'ওসব টাকায় খবর্দার হাত দিবি না নিরু! টাকা আছে।'

এবারে নিরুর অবাক হবার পালা। —'আছে? টাকা আছে তোমার? কোথায় আছে টাকা?'

সেই বিকৃত স্বর জানায়—'আছে মানে, ইচ্ছে করলেই হতে পারে। পাঁচ বছর ধরে ওদের অফার আমি রিফিউজ করছি। এবার নিয়ে নিলেই হোলো।'

—'নিলেই হোলো, তো নাওনি কেন এ্যাদ্দিন? কাদের অফার? কিসের অফার?'

—'নিইনি, সে কারণগুলো সব আজেবাজে। অফারটা—ডেইলি স্টারের এডিটরশিপ।'

তারপরে যেন নিরুকেই সান্ত্বনা দিতে অনুপম রায় বললেন—'পড়ানো আমাকে ছাড়তেই হবে এবার', বলতে বলতে গলায় হাতটা সন্তর্পণে ছোয়ালেন,—'প্রোফশনটা বদলাতে হোতোই।'

এবার নিরুই চমৎকৃত। টাকার ব্যবস্থা মানে চাকরি-বদল? দাদা কি সবটা ভেবে দেখেছেন ভালো করে?—হ্যাঁ, অনুপম জানান খুব ভালো করে। দাদার মতামত সর্বদাই সুচিন্তিত এবং শেষ পর্যন্ত শিরোধার্য। নিরু মেনে নেয়।

মোটামুটি একটা প্ল্যান খাড়া করে রেখে, নিরুপম চলে যাবার পরে অনুপমের মনে হোলো নিরুটা ছেলেবয়সে কী দুর্দান্তই ছিলো। সারাক্ষণ পাড়ার গুণ্ডা ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে আসতো, রায়বাড়ির নিরামিষ আহার তাকে বিন্দুমাত্রও অহিংস করেনি। ওদিকে গাছ থেকে পাখির বাসা পড়ে গেলে সেই ভাঙা ডিম দেখে

হাপুস নয়নে কাঁদতে বসতো এই নিরুই। অনুপম জীবনে যেমন মারামারি করেন নি, তেমনি নিরুর মতো রাস্তা থেকে নোংরা বেড়ালছানা, ঘেয়ো কুকুরছানা কুড়িয়ে এনে বাড়িতে জড়োও করেন নি। নিরুটা চিরকালের পাগল। 'ক্রেজী বয়'। নিজের মনেই হাসলেন। সস্নেহে। এবার কি রামশরণ আগরওয়ালাকে একটা ফোন করবেন দিল্লিতে? নাকি, মাঙ্গেশকরের থ্রু দিয়ে···না, 'থ্রু' দিয়ে যাবার প্রশ্ন নেই, কারণ তাঁর পদমর্যাদাটা হবে মাঙ্গেশকরের মাথার অনেকটা ওপরে। বলতে হলে, রামশরণজীকেই, নইলে একদম সোজাসুজি, আরো ওপরে, স্যর রাঘবনকে বলা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো কালও রাঘবন কলকাতায় ছিলেন। মাঙ্গেশকরকে একটা ফোন করে জেনে নেবেন, রাঘবন এখন কোনখানে?

থাক। এক্ষুনি থাক।

জানলায় আকাশের একটা অংশ। পর্দার মাথায় এক চিলতে সরু আকাশ। তাতে কেবল তিনটে ঝকঝকে তারা। পাশাপাশি। বিনু-ঝি বলেছিলো, রামলক্ষ্মণসীতা। কিন্তু বাবা চিনিয়ে দিয়েছিলেন—ওটা কালপুরুষের কোমরবন্ধ—এখন অনুপমের জানলায় বাঁধা। হাঃ।

গ্রীষ্মকালে ছাদে মাদুর পেতে যখন শুতেন, বাড়ির বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে বাবা যত্ন করে আকাশের তারা চেনাতেন। বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বাবা যেন নিবিড় ব্যক্তিগত পরিচয় করিয়ে দিতেন শ্লোক বলে। গল্প বলে। নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম, গ্রহান্তরের ঠিকানা—ওদের বাবাই চিনিয়েছিলেন প্রথম। চিৎ হয়ে শুয়ে লক্ষ কোটি তারার দিকে তাকালে এখন কেমন অস্বস্তি হয়—একটা বিশাল, সুদূর, অপরিচিত রহস্যলোক। অথচ ছেলেবেলায় মনে হতো প্রত্যেকটি তারাই যেন প্রতিবেশীর খোলা জানালার চেনা আলো।

সেই যুগে কৃষ্ণচৈতন্য রায় লোকটাকে ভালোই লাগতো বেশ। যতোদিন না ফুলকাকী···

অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে এলানো মনটাকে একাগ্র করলেন অনুপম—মাঙ্গেশকরকে ফোন করা দরকার, স্যর রাঘবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলা চাই। অনুপম, ঘড়ির দিকে চাও। ভদ্র সময়ের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা উচিত নয়।

কিন্তু হাত যেন চলে না। না, এখন প্রায় এগারোটা, আর ফোন করা চলে না। কাল? কাল সকালে ডেকো। দিল্লিতে, বোম্বাইতে যেখানেই থাকুন, স্যর রাঘবনকে ফোনে ধরা শক্ত হবে না। সমস্যা একটাই। এডিটোরিয়াল পলিসি নিয়ে। ডেইলি স্টার—গ্রুপেরই ওভার-অল জেনারেল গাইড-লাইন আছে, দিব্যি বোঝা যায়, যেটা অনুপমের আদর্শের সঙ্গে মেলে না। 'ডেইলি স্টারে'র ক্ষেত্রে ঐ কাগজের এডিটোরিয়েল পলিসিটা পুরোপুরি যদি অনুপমের হাতে ছেড়ে দেওয়া না হয়, তাহলে ওঁর পক্ষে কাজটা নেওয়া সম্ভব নয়। স্যর রাঘবন কি রাজী হবেন? তাঁর নিজস্ব মতামত তাঁরই নিজের কাগজে চলবে না—এটা কেউ সহ্য করবে না, তা ছাড়া এদের একটা যখন প্রোনাউন্সড এডিটোরিয়ল পলিসি চালু রয়েছে।—এ তোমার পার্শীসাহেব দস্তুর নয়, এ খাঁটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তায় আবার নাইটহুডপ্রাপ্ত। এর গোঁ তোমার গোঁয়ের চেয়ে কম হবে না অনুপম। তাছাড়া এটা তোমার ফ্রী-লান্স লেখা নয়, এটা চাকরি।

ট্রু, হি হ্যাজ আ লট অফ রেসপেক্ট ফর য়ু, য়েট, অনুপম, পারবে কি? তুমি কি পারবে?

অনুপম দেরাজ খুলে খুঁজতে লাগলেন পরিত্যক্ত কোনো পাইপ, কোনো পুরোনো তামাকের কৌটো যদি মিলে যায়—খুঁজতে খুঁজতেই মনে পড়লো—নিষেধ আছে। দেরাজ বন্ধ করে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠুনঠুন করে একটা রিক্সা যাচ্ছে। একপাল কুকুর

সতর্জনে তাড়া করেছে তাকে। রিকশায় এলিয়ে আছেন একজন সুরাশ্রান্ত মধ্যবয়স্ক পুরুষ। অনুপম সেই মানুষকে বললেন, তুমি বেশ আছ। বীতরাগভয়ক্রোধ তুমিই মুক্তপুরুষ। তোমার দুঃখও নেই, সুখও নেই।

অনুপম দূরে দৃষ্টিপাত করলেন। ওই বহুতল অট্টালিকার মাথায় লাল আলোটা রাত্রিভোর দপদপ করে আকাশের কাছে মর্তের সীমানা বিজ্ঞাপিত করছে। গগনবিদারী যন্ত্রের গতিময়তাকে সীমানা নির্দেশ করছে স্থির, অবিচল মাটি। বলছে, দেখো বাপু, বেশি নিচু যেন হোয়ো না, নিজেই বিনষ্ট হবে। আরো উঁচু দিয়ে, আরো ওপর দিয়ে উড়ে যাও। এখানে তোমার পথ বন্ধ, কারণ আকাশ এখানেই সমাপ্ত।

অনুপম আরো ওপরে চাইলেন। এবারে কেবলমাত্র কোমরবন্ধটুকু নয়—খোলা অন্ধকারে ঝলসে উঠলেন কালপুরুষ। আকাশচারীদের তিনি আরেকরকম নির্দেশ দেন। অন্য এক দিগন্তের সীমা বেঁধে দেন। এতা উর্ধ্বে উঠো না বৎস, এ যে মহাশূন্য—এখানে মহাকাশ—তুমি গগনবিহারী যন্ত্রযান, এখানে তোমার পথ নেই। এ হলো আকাশের ওপারে আকাশ—এই আলো গ্রহান্তরী আলো, এই অগ্নিময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে তোমার অধিকার নেই।

ক'টা বাজলো ?

কাল সকালেই প্রথম কাজ মাঙ্গেশকরকে ফোন করা। কনডিশান দুটো থাকবে—এডিটোরিয়ল পলিসি বিষয়ে স্বর রাঘবন বা রামশরণজীর নাক গলানো চলবে না—এবং অন্যত্র লেখার পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। নইলে দস্তুরকে কী বলবেন তিনি ?

অবশ্য, এসব না করে হাজার তিরিশেক টাকা ধার নিলেই হয়—দস্তুরকে বলবেন এ্যাডভান্স করতে ? সেরে উঠে আস্তে আস্তে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দেবেন।—যদি প্রত্যাখ্যান করে ?

প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চাইতে প্রত্যাখ্যান করাটাই ভালো। যদি ওঁর কনডিশনে স্যর রাঘবন রাজী হন—যদি রাজী না হন? সেটার সম্ভাবনাই বেশি। তাহলে? থিংক অব এ্যান অলটারনেটিভ। —কী আবার? ব্যাংক থেকে ধার নেবেন। অসুবিধা এত কী? What ails thou, Faustus? তার চেয়ে বরং অয়েল সাব-কমিটির কাজটা শেষ হয়েছে, এবারে ফাইন্যাল করে ফেলা যাক। ঘুম যখন আসবেই না।

—'এত রাত্তিরে লিখতে বসবেন?' টাইপরাইটারে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন।

—'তুই শুসনি, কেষ্ট?'—শুধু ঠোঁট নড়লো।

—'আপনি তো খেতেই বসলেন না আজ।'

—'খাইনি? খিধে নেই একেবারে। তুইও খাসনি নাকি? সর্বনাশ।'

—'আমি? কখ···ন খেয়ে নিয়েছি। এবারে শুয়ে পড়ুন দাদাবাবু। আপনার শরীর ভালো নেই।'

—'একটু লিখে নিই?'

—'এই রাত্তির দুটোয়?'

—'দুটো কোথায়?'

—'ওই হোলো। দেড়টা।'

—'জরুরী লেখা আছে।'

—'তা হোক, শুয়ে পড়ুন। আজ ইঞ্জেকশন নিয়েছেন, আর টাইপ করবেন না।'

—'(তুমি জ্বালিও না তো কেষ্ট)।'

—'তুমি শুয়ে পড় কেষ্ট।'

—'আপনি শোবেন না?'

—'একটু পরে।'

কেষ্ট চলে গেল।

তুমি তো জানো না কেষ্ট, আমার ঘুম আসছে না। কাজটার জন্যে জেগে নেই আমি, জাগ্রত বলেই কাজে বসছি। আমি জানি তুমি আমার শুভাশুভের সঙ্গী। তবুও তোমাকে বলা যাবে না কেন আমার ঘুম আসছে না।

একসময়ে মাথাটা ভারী হয়ে এলো, কয়েকটা সীসে-ভরা বল কেউ গড়িয়ে দিল খুলির ভিতরে, আকাশে কখন মিলিয়ে গিয়েছেন আঁধারবিহারী কালপুরুষ। দিব্য মহিমায় আরেক দ্যুতিমান পুরুষের রথচূড়া ফুটে উঠেছে পূর্বদিগন্তে।

লেখাটা কি ভালো হলো? আর কিছুই ভাবতে পারা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। মাথার মধ্যে করতাল বাজছে, চোখে, মনে ক্লান্তির গাঢ় পর্দা নেমে আসছে। সকাল হয়ে আসছে। এবার ফোন করতে হবে।

অবশ্য এক্ষুনি নয়। এখন মোটে সাড়ে চারটে। আটটার আগে কাউকে ফোন করা যায় না।

বিছানার দিকে ক্লান্ত পা টেনে নিয়ে এলেন। রাত্রে উচিত ছিলো একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নেওয়া। কি আশ্চর্য, রাত্রে একবারও মনে পড়লো না? এখন আর সম্ভব নয়। এই সময়ে ঘুমোলে ফোনটোন সব গোলমাল হয়ে যাবে। এখন শুতে হবে না। বরং একটু হেঁটে আসা যেতে পারে। কিন্তু শরীর···মাথার মধ্যে সেই মালটি-স্টোরিড বিলডিঙের রক্তচক্ষু দপ দপ করে জ্বলছে, রগের শিরা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

বিছানা থেকে ফিরে এসে অনুপম স্নানের ঘরে ঢুকলেন। নিরাবরণ হয়ে ঝর্ণার নিচে দাঁড়াতেই সহস্র শীতল আঙুল বুলিয়ে জল অনুপমের সর্বাঙ্গে, স্নায়ুমূলে নিবিড় করুণা সিঞ্চন শুরু করলে।

বাবার একটা বই ছিলো, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। তাতে প্রায় সব রোগেরই চিকিৎসা ছিলো 'দুই বেলা স্রোতস্বিনী নদীর জলে অবগাহন স্নান।' বাত? অবগাহন। অজীর্ণ? অবগাহন। সর্দি কাশি? অবগাহন। অনিদ্রাতেও নিশ্চয় অবগাহন।

এ অবশ্য অবগাহন নয়। এ হলো ধারাস্নান। এও আরেকরকমের প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এতেও স্নায়ু শীতল হয়। রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়। পশ্চিমি পদ্ধতিতেও সরল স্নায়ুচিকিৎসার প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ধারা—এই ধারা-পাত। ধারাপাত? ছেলেবেলায় বাবাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন অনুপম—নামতার বইয়ের এমন কাব্যিক নিসর্গ-ঘেঁষা নাম কেন?

ধারাপাত?—বাবা বলেছিলেন, সেকালে ভারতের ঋষিরাই ছিলেন বিজ্ঞানী, আবার ঋষিরাই ছিলেন কবি। তাই এরকম মনো-ভঙ্গি ভারতের ঐতিহ্য। দ্যাখো না, 'অ্যালফাবেট' এই খটখটে কাজ-চালানো নামের চাইতে 'বর্ণমালা' কথাটি কতো সুন্দর, কতো ব্যঞ্জনাময়। ওতে কেমন রং আছে, সূত্র আছে। আর সেই মূল শব্দ? অ-ক্ষর? আহ্! বাবা কথায় কথায় কোথায় যেন চলে যেতেন। বাবার পৃথিবীটাই অন্য ছিল। অথচ সেটাই তো বাবার একমাত্র মুখ ছিল না। সেটা ছিল ছেলেদের দেখাবার জন্য মুখোশ। যেমন বাবার নিত্য গঙ্গাস্নান। আর অবগাহনস্নান মানেই বাবা বুঝতেন গঙ্গাস্নান। বহতাস্রোত হওয়া চাই। বাড়িতে স্নান করলেও বাবা মুখে গঙ্গাস্তোত্র বলতেন। কিন্তু হে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা, তুমি কি সত্যিই ত্রিভুবনকে তারণ করতে জানো? তোমার তরল তরঙ্গে যে কোনো তপ্ত তাপিত নিশ্বাস কি তুমি জুড়িয়ে দিতে পারো? কোনো খণ্ডিত অন্তর্লোককে তুমি কি স্নেহ দিয়ে পুনর্নব করে দিতে পারবে?

একসময়ে মনে হল জলমর্মরকে বিদীর্ণ করে কোথাও একটা ঘন্টি বাজলো। দি আর্লি মর্নিং নক? না—আমার দরজায় নয়। নিশ্চয় পাশের ফ্ল্যাটে। আবার তীব্র হলো সেই ঘন্টি। এখন মোটে পাঁচটা। কে হতে পারে? কী হতে পারে? টেলিগ্রাম? নিশ্চয় পাশের বাড়িতে। এবার অনুপম কল বন্ধ করে দিলেন। সমগ্র ইন্দ্রিয় একাগ্র করে কান পাতলেন। মনে হলো কেষ্ট দরজা খুলছে। তবে তো আমার বাড়িতেই। তোয়ালে টেনে নিতে গিয়ে সোপকেসটা পড়ে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়লো পিছল সাবানটা, যেন জ্যান্ত একটা ব্যাঙ। সবটা জেনেও, বুঝেও, কেমন একটা আত্মরক্ষার রিফ্লেক্স এ্যাকশনে অনুপম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। একমুহূর্ত শুধু, তার পরেই নিচু হয়ে সাবানটি তুলে কলের নীচে ধুয়ে সোপকেসে ভরলেন। কেসটা তুলে রাখলেন।

সব কিছু যেমন-কে-তেমনি রয়ে গেছে। কেবল ভিজে সাবানটা পড়ে গিয়ে একপাশে তুবড়ে বেঁকে গেলো। উনি সেটা খেয়াল করলেন না।

ঘন্টি কারা বাজালো?

ওদের কিটব্যাগটা উনি জমা দিয়েছেন এই ক্রোধেই কি;··· সোমেনের বডিটা গঙ্গার ধারে পিছমোড়া মাত্র পরশু সকালেই······

হঠাৎ অনুপমের মনে হলো জীবনের চারভাগের আড়াই ভাগই এখনো জানা বাকী। কী লাভ হয়েছে এতো কাজ করে? কী পাওয়া গেছে? কোনটা সত্য? কোনদিক থেকে ভাবলে সত্যকে ছোঁওয়া যায়? কোন্ দিকটায় জীবনের সত্যমুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা ঢাকা রয়েছে? এই অনুপমের দিকে, না, সেই সুধার দিকে?

যা হয় হোক। আর তিনি পারছেন না। ছেলেরা আসে

আসুক। তিনি যাবেন। বলবেন—কী হয়েছে, ব্যাপার কি?
এতো ভোরে?

কোমরে বড়ো তোয়ালেটা জড়িয়ে, ভিজে গায়ে শার্ট চড়িয়ে, পায়ে চটি, চোখে চশমা, ছোট তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন অনুপম। যত ভোরেই হোক, যত গ্রীষ্মই হোক, খালি গায়ে, খালি পায়ে নগ্ন চোখে অনুপম জনসমক্ষে উপস্থিত হন না।

—'কী হয়েছে কেষ্ট? ব্যাপার কি? এত ভোরে?' কিন্তু কথাগুলো সবই গলার মধ্যে জট পাকিয়ে জড়িয়ে গেল। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি আবার তাঁর কণ্ঠ রোধ করেছে।

—'মা এসেছেন দাদাবাবু।'

যুদ্ধক্ষেত্রে শরবৃষ্টির পরিবর্তে এ যেন পুষ্পবৃষ্টি হলো—কিন্তু মা এত ভোরে কেন? নিরুদের কিছু ··

—'এতো ভোরে নাইচিস যে? রাতে ঘুমোস নি বুঝি?'

মার স্বাভাবিক স্বর শুনে নির্ভার হলেন অনুপম। কিন্তু কৌতূহল দ্বিগুণ হল।

—'কেষ্ট, দাদা ছোড়দার জন্যে ভালো করে চা করো তো বাবা? নিরুটাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনিচি—অনু, বাবা, তোর গলাটা আজ কেমন আছে?'

এই জন্যে? এই ভোরবেলায়? ফোনেই তো খবর নেওয়া যেতো! মুখে অনুপম অবশ্য কিছুই বললেন না ঘড়ঘড়ঘড় ছাড়া।

—'সর্ব্বোনাশ। এই অবস্থা? চল, ঘরে চল বলচি, একটা কথা বলতে এলুম।'

এবার নিরুপম বললো, 'মা তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করবেন দাদা, কিন্তু তুমি আগে তোয়ালেটা ছেড়ে দয়া করে পাজামা পরে এসো। তারপরে কথা হবে।'

মা বললেন, 'অনু, বাবা, তুমি কি অন্য কাগজের লোকেদের জানিয়ে ফেলেচো ?'

—'মানে ?'

—'নিরুর মুখে শুনলুম, তুমি নাকি অনেক দিন আগেই কোন্‌-খানে একটা বড় চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলে, কিন্তু চার পাঁচ বছর ধরে ওটা নাওনি ?'

—'হুঁ।'

—'তবে ওটা এখনও নিও না বাবা।'

—'মা ?'

—'হ্যাঁ বাবা। আমি তোমার মা, আমি বলছি ও চাকরি তুমি নিও না। আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তাই বলতেন।'

—'মা।'

—'আমি ভেবে চিন্তেই বলচি অনু। এইটে বলবো বলেই ভোর রাত্তিরে নিরুকে টেনে তুলে ছুটে এসেচি বাবা। এসব কথা কি টেলিফোনে বলা যায় ? প্রাণ যাতে সাড়া দেয় না, তেমন কাজ করতে নেই বাবা।'

—'কিন্তু······'

—'কোনো কিন্তু নয় অনু। ও চাকরিতে তোমার মন নেই। ও তুমি নিও না।'

—'কিন্তু মা (কেন তুমি বারণ করছো ?)···'

—'বাবা, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—আমি কেমন করে বুঝবো কোন চাকরিটা ভালো, কোনটে মন্দ। কিন্তু তোমরা তো বিদ্বান, ভালো-মন্দ তোমরা সবই বুঝতে পারো। আমি সেই জন্যেই বারণ করছি। তোমার নিজের মনই যখন চার পাঁচ বছর ধরে কু গেয়েছে, তখন নিশ্চয় এতে কোনো মন্দ আছে অনু, কোনো ক্ষতি আছে। না, তুমি ও কাজটা নিও না।'

—'কিন্তু এখন তো · '

—'বিপদে পড়লে মুনিঋষিরও মতিভ্রম হয় বাবা। তোমার উপযুক্ত ভাই রয়েছে, তোমার মা বেঁচে আছে—কেন তুমি মন যা চায় না তেমন কাজ করতে যাবে বাছা? তোমার কিসের অভাব?'

—'দাদা, রাঘবনকে কি ফোন করেছিলে?'

—'কাল করা হয় নি।'

—'ঠাকুর রক্ষে করেছেন। রাধামাধব রক্ষে করেছেন। ফোনটোন তুই করিসনি অনু। টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি। তোমার বউয়ের নামে আমার গয়না গড়ানো নেই? সেইটে বাঁধা রেখে বেশ কিছুটা এখুনি তোলা যাবে—বাকিটা নিরু যেমন করে পারে দিক······'

—'বাঁধা রেখে?' বিদ্যুৎঝলকের মতো অনুপমের খেয়াল হয় ফ্ল্যাটটাই তো বাঁধা রাখা যায়। এমন কি ফ্ল্যাটটা না কিনলেও হয়। ওই টাকাটা সবটাই এখুনি ফেরৎ পাওয়া যাবে; ক্যামাক স্ট্রীটের সাহেবী ফ্ল্যাটের জন্য এই দরিদ্র দেশে ক্রেতার অভাব হবে না।

কী দরকার ছিলো এতো উদ্বেগের, যখন ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলেই সবটা মিটে যাচ্ছে। তাহলে কি···প্রকৃতপক্ষে তুমি কি তাহলে··· সম্পত্তিলোভী? অনুপম, বিষয় সম্পত্তির আকর্ষণ তোমার এতই বেশি—যে 'ডেইলি স্টার'এ যোগ দিতেও তোমার বাধছিল না? তুমি যে নিজেকে নির্লোভ, অসম্পৃক্ত, দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নচিত্ত সুখেষু বিগতস্পৃহ—স্থিতধী ব্যক্তি বলে মনে করতে ভালবাসো, সেসব তাহলে বাজে কথা?

নইলে, কেন একবারও তোমার মনে হোলো না, যে তোমারও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ছিলো?

নিরুর চেয়ে তোমার উপার্জন ঢের বেশি। কিন্তু নিরুই বেশি ধনী।

নিরুর অপার ঐশ্বর্য।

সংসারী নিরু, হালকা, আড্ডাবাজ নিরু, ছোটো সুখ, ছোট দুঃখে ন্যাতাজোবড়া নিরু এক কথায় সারা জীবনের সর্বস্ব সঞ্চয় অন্যের জন্যে খরচ করে ফেলতে পারে।

—'মা, আমি ফ্ল্যাটটাই বেচে ফেলবো। তাতে থোক টাকা উঠে আসবে। সব টাকা ঐতেই আটকে রয়েছে। নিরু, তুই ভাবিস নারে।'

অনুপমের গলা দিয়ে একটা আর্ত স্বর নিঃসৃত হয়। কথাটা বলতে বলতেই অনুপমের মাথার মধ্যে বহুতল অট্টালিকার রক্তচক্ষু বাতিটি টুপ করে নিবে গেল। কানের মধ্যে একটা মেসিন চলার মতো গুম্‌গুম্‌ আওয়াজও যেন আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ এই ভোরবেলার শান্তি, এই প্রাক্‌-সূর্যোদয় স্পষ্টতা, পাখি-জাগার সময়ের স্তব্ধতা—অনুপমের ভেতরে ভেতরে বিছিয়ে গেল।

চা-বিস্কুট খাবার পরে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিরু বললো—

—'যাক বাবা! এবার নিশ্চিন্তি হয়ে অফিসে যাওয়া যাবে। আর দাদা, সত্যি! ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবার কথা, তোমার-আমার কারুরই আগে খেয়াল হোল না?'

মা বললেন—'সে কথা থাকগে। তবু যে মনে পড়েছে শেষ পর্যন্ত সেই ভাগ্যি। নিরু, আমি বৌমাকে বলে এসেছি ঠাকুরকে তুলবে। আমি আজ অনুর কাছে থাকবো।'

॥ ২০ ॥

নিচে নিরুর গাড়ি রওনার শব্দ শুনতে শুনতেই অনুপমের দু চোখ জড়িয়ে এলো। হঠাৎ যেন সারা শরীরে রাত্রি জাগরণের অবসাদ বারো ফুট উঁচু ঢেউ ভাঙলো। মাকে জানালেন, এখনই প্রাতরাশ নয়, একটু শোবেন এখন অনুপম।

বিছানায় শুয়েই প্রথমে মনে হোলো—'যাক!' মাথার মধ্যে এই পাখি-ডাকা, আলো-ফোটা পরিচ্ছন্ন ভোরবেলা। মাঙ্গেশকরকে আর ফোন করা নয়, বরং সুকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে। যাক। একটা জিৎ, একটা ফয়সালা শেষ। কিন্তু ফ্ল্যাট ফেরৎ দেবার সময়ে সুকুমার চক্রবর্তীর মুখের ভাবটা কল্পনা করেই অনুপমের মাথার মধ্যে ফের হাজারকতক আলপিন ফুটলো।—'অনেকেই ফেরৎ দিয়ে দেয়, সবাই তো শেষরক্ষা করতে পারে না'—চক্রবর্তীর মুখে এ কথাটা লেগেই আছে। অনুপম রায়ও সেই দলেই পড়লেন। সেই শেষরক্ষায় অপারগ অনেকের দলে।

এমন সময়ে চুলের মধ্যে বিলি কাটলো কার হালকা সরু আঙুল 'ফুলকাকী?' মনে হতেই আবার সেই কষ্ট। সেই শ্বাসকষ্ট। এই অসহ শব্দে বুঝি এ্যালার্জি আছে অনুপমের। অনুর ফুলকাকী। ফুলকাকীর অনু। এমনি করেই চুলের ভিতরে বিলি কেটে রোজ-রাত্রে অনুকে ঘুম পাড়িয়ে দিতো ফুলকাকীর সরু, নরম আঙুল-গুলো। অনু নামের ওই ছেলেটাই ছিলো নিঃসন্তান শিশুবিধবা ফুলকাকীর দিন এবং রাত্রিগুলির কেন্দ্রবিন্দু।

…দূর, যত বাজে ভাবনা। ফুলকাকী কি করে হবে। ফুলকাকী তো, কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

—'কিছু বললি অনু?' —মায়ের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন অনুপম রায়।

—'কই, না তো।'

—'মনে হলো যেন কিছু বললি। তোর কোনো কষ্ট হচ্ছে? মাথাটা টিপে দোবো?'

—'না মা। ঘুম পাচ্ছে।'

—'ঘুমো বাবা। ঘুমো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

—'মা?' একটুক্ষণ ছটফট করার পরে অনুপম ডেকে ফেললেন। মায়ের সেবা পাওয়া তাঁর অভ্যেস নেই। একান্নবর্তী সংসারে মা কোনোকালেই নিজেই সন্তানদের আলাদা করে যত্ন করতেন না, জ্বরজাড়ি না হলে। সেও ফুলকাকী মারা যাবার পর থেকে।

আজ এই এতো বয়সে হঠাৎ অঙ্গে মায়ের অপরিচিত স্পর্শ পেয়ে আরামের চেয়ে অস্বস্তিই বেড়েছে অনুপমের। মা, হাতটা সরিয়ে নাও। মা, তোমার আদর আমার সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু এসব কথা তো বলা যাবে না।

—'মা?'

—'কি রে?'

—'বাবাকে তোমরা অতো প্রশ্রয় দিতে কেন মা? তুমি আর ঠাকুমা? কী করে পারতে তোমরা?'

চুলের মধ্যে সঞ্চরমান আঙুলগুলি হঠাৎ প্রস্তরীভূত হয়ে পড়লো। কেউ যেন মাকে 'স্ট্যাচু' খেলায় ডেকে নিয়েছে।

—'কার কথা বলছিস তুই, অনু?'

মার গলা চিরে ফেলে একটা আর্ত শব্দ।

—'বাবার কথা।' অনুপমের স্বরে ক্লান্তি থাকলেও ভারসাম্যের অভাব নেই।

—'বলছি ও লোকটাকে এত প্রশ্রয় দিতে কেন তোমরা?'

—'প্রশ্রয় !'

—'তোমরা মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর। মেয়েদের জন্য তোমাদের কোনো মমতা নেই। যে লোকটার জন্যে ফুলকাকীমাকে ঐভাবে মরতে হোলো, তাকে তোমরা সহ্য করতে কেন ?'

—'কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে তার কী যোগ ? তোমার বাবার জন্যে তো ফুলকাকীকে মরতে হয় নি।'

মার শান্ত জবাবটি যেন একগাড়ি অন্যমনস্ক ট্রেনযাত্রীকে বেদম চমকে দিয়ে হু হু করে হুইসিল বাজিয়ে ঝনঝনিয়ে পার হয়ে গেল।

—'মা··· !!'

অনুপমের স্বভাবসংযত কণ্ঠ এখন রোগের প্রকোপে আরো নিচু হয়েছে। সেই কণ্ঠ থেকেই যে এই তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ নির্গত হলো এ যেন বিশ্বাস হয় না। মা ভয়ানক চমকে উঠলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

—'মা ?' নিচু গলায় প্রশ্নের সুরে পুনরায় বিনীত মাতৃ সম্বোধন করলেন অনুপম।

—'কি বাবা ?'

ত্রিশ বছরের ওপার থেকে সেই যে ছেলেটা একদিন ঘুম থেকে উঠে উঠোনে একটা বিকৃত পুড়ে-যাওয়া শরীর দেখেছিলো, সে বললো—

—'তুমি ঠি—ক জানো মা ?'

—'এতে ভুল জানার কী আছে বাবা ?'

—'তবে জ্যাঠাইমা কেন বাবাকে···'

—'জ্যাঠাইমার কথা বাদ দাও।'

—'মানে ? বাদ দেব কেন ?'

—'তোমার জ্যাঠাইমা কিছুই জানতেন না বাবা।'

—'সে কী? তোমরা প্রতিবাদ করলে না কেন মা? এখনও তো প্রত্যেকদিন জ্যাঠাইমা তোমাকে...'

—'দিদি কিছুই জানেন না বাবা।'

—'কেন? কেন জানেন না? কেন, জানিয়ে দাওনি তোমরা ওঁকে, আমার বাবা দোষী নন, দুশ্চরিত্র, খুনে উনি যা যা বলতেন বাবা তার কোনটাই হয়তো...'

—'হয়তো' কেন বাবা। উনি দেবতার মতো মানুষ ছিলেন।' মার হাত দুটি আপনি জোড় হয়ে কপাল ছোঁয়।

—'চুপ করো, চুপ করো মা....'

—'মানুষটা তোমাকে কত ভালবাসতেন, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো নি অনু?'

—'মা, কেন তোমরা আমাকে বলোনি তখন?'

—'কী বলবো?'

—'কেন বলোনি যে জ্যাঠাইমা মিথ্যা বলেছেন, জ্যাঠাইমা ভুল বলছেন—'

—'কী করে বলবো। তোমার বাবাই যে বলতে দেন নি।'

—'বলতে দেন নি? কেন? কেন?' (কাকে বাঁচাতে, কার দোষ ঢাকতে চাইছিলেন বাবা?)

—'অনু, তুমি বড্ড কথা কইছো বাবা। তোমার একেবারে কথা বলা উচিত নয়।'

—'আমাকে বলতে দাও। কেন বলতে দেন নি? কার দোষ ঢাকছিলেন তিনি?'

—'তোকে আর দোষ দেবো কি, তোর ঠাকুরমারও অসহ্য হয়েছিলো। তোর বাবা তাঁকেও দিব্যি দিয়ে বারণ করে রাখলেন।'

—(বিন্নুঝিকে দিদির ননদ বলল—একথা কি সত্যি, যে তোমাদের বাড়ির ছোট বৌটাকে বৌদিদির কাকা মেরে ফেলেছে?

বিন্নুঝি বলল—পাগল নাকি ? সে তো নিজে পুড়ে মইরেচে···দিদির ননদ বল্ল—হ্যাঁ, কিন্তু পেটে তার বাচ্চাটি ছিল যে বৌদিদির কাকার···
বিন্নুঝি বলল—বড়মা তাই বলে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না—নিচ্চয় আর কেউ ! ছোটবাবু ন্তাবতা ! —ন্তাবতাই, তবে অপন্তাবতা ! ভণ্ড ! খুনে ! লম্পট ! ওকে তো ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত !)

—'দিব্যি দিয়ে ? বারণ ? কেন মা ?' বালকের অবোধ প্রশ্নকে প্রবোধ দিতেই যেন মায়ের স্বর গাঢ় হল, মৃদু হল, আবার কখন আঙুলগুলি প্রাণ পেয়ে ঝিরঝির করে খেলতে শুরু করেছে অনুপমের চুলে, স্বপ্নে কথা বলার মতো অন্য মনে মা স্বগত বলে গেলেন—

—'উনিই বলতে দিলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, কী হবে বলে ? ফুলবৌ তো ফিরে আসবে না। যে গেছে সে গেছে, ঠাকুর তাকে দেখবেন। যে আছে, তোমরা তাকে আরাম দাও। বৌদির এটা না জানাই ভালো।

'আমারও খুব অস্থির লেগেছিলো। এই তোমার মতনই। উনি বললেন, মানুষের চক্ষুলজ্জাটুকু ওভাবে ভেঙে দিতে হয় না। দাদা যখন বৌদিকে ভয় পেয়ে ওকথা বলেছেন, তখন বৌদি ওটাই বরং জানুন। তোমার ঠাকুমাকে গিয়ে বললেন, মা, তুমিও জানো আমার দোষ নেই, অনুর মাও জানে আমার দোষ নেই, আর দাদা তো জানেনই। ব্যস, হয়ে গেলো ! আর তো কারুর কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না। একমাত্র বৌদিদি না হয় নাইবা জানলেন। এটুকু ঢাকা থাক না মা ! ওদের মধ্যে শান্তি থাক।

'তোমার বাবার জন্যেই তো আমরা কোনোদিন একটা কথা কইতে পারি নি। বাড়ির ঝি চাকরেরা পর্যন্ত সব জানতো। তোমার বাবাই ওদের জনে জনে ডেকে, আদর করে বলে বুঝিয়ে মুঠো ভর্তি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। দাদার সাত মেয়ে ছিল, মোট দুজনের তখন বিয়ে হয়েছে। কথাটা ছড়িয়ে পড়াও মুশকিলের হ'ত।'

—'কী আশ্চর্য! কী ভীষণ! কিন্তু তুমি আমাকে কেন বল নি মা? কেন কোনো দিনও বললে না? কেন বললে না মা? কেন? কেন? কেন?'

গোঙানি আর গর্জন মিশিয়ে একটা চাপা অমানুষিক আর্তনাদ বেরুলো। অনুপমের চিরকালই উপুড় হয়ে শোওয়া অভ্যেস। এখন বালিশের মাংসে বসে যাচ্ছে ওঁর নোখ, ওঁর দাঁত।

—'কী বলবো বাবা? তুমি তো কোনো দিন জিজ্ঞেস করোনি? আজ জিজ্ঞেস করলে, তাই বললুম।'

—'নিরু? নিরু জানে?'

—'হ্যাঁ, নিরু তো কবে থেকেই জানে। নিরুকে উনিই বলে গেছেন।'

আর্তনাদের উত্তরে মৃদু ধীর স্বর এল—'নিজে বলে গেছেন?'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে নিরু বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, 'বাবা, ফুলকাকীর কথা বড়মা যা যা বলেন সব কি সত্যি? আমি সত্য কথা জানতে চাই।'

বাবা তখন ওকে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে রাধামাধবের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে বড়মাকে এ নিয়ে কোনোদিন কিছু জানাবে না, তারপর খুলে বলেছিলেন সব কথা। রাধামাধবকে সাক্ষী রেখে।

—'তুমি তো কখনো প্রশ্ন করো নি বাবা। আমি ভেবেছি তুমি হয়তো সব জানো। তুমি তো আরেকটু বড়ো ছিলে।'

অনুপমের শ্রবণে তখন একত্রে ধ্বনিত হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের অব্যক্ত প্রবল সঙ্গীত 'মিউজিক অফ দ্য স্ফিয়রস'। সৌরমণ্ডলে গ্রহাবর্তনের গতিময়তার সেই অপ্রমেয় মহাগুঞ্জন, যা মাত্র দেবদূতেরই শ্রুতি-গোচর, নশ্বর ইন্দ্রিয়ের সহনাতীত সেই পরম ধ্বনিতে অনুপম রায়ের অন্তর্লোক তখন অনুরণিত।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

তারপরেই। মনে পড়লো এক বৃষ্টিধূসর শীতজর্জর তীক্ষ্ণ বাতাসে ছিন্নভিন্ন জানুয়ারির অন্ধকার দুপুর—লণ্ডনের তুহিনকর্দমাক্ত অনাত্মীয় রাস্তা—বালিশের মধ্যে আরো গভীরে মুখখানা গুঁজে ফেললেন অনুপম, যেন ওইভাবে দম বন্ধ করে মেরে ফেলা যাবে স্মৃতিকে··· ভ্রান্তিকে ···পাপকে···হ্যাঁ, পাপকে।

দাঁতে-দাঁত অনুপমের ওষ্ঠাধর জোর করে দুবার ফাঁক করিয়ে, খুব ছোট্টো, খুব চাপা, সম্পূর্ণ শব্দহীন একটি গহন, বিজন, দীন সম্বোধন যেন আপন শক্তিতে আপনি নির্গত হয়ে এলো :

—'বা···বা!'

॥ ২১ ॥

চোখ বুজে আছি, কিন্তু মন বোজেনি।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম—মনকে ফিরিয়ে আনো, বশে আনো অনুপম, মনকে সংযত করো। তুমি পারো নি। স্বীকার করো অনুপম, তুমি পারো নি। তুমি বিভ্রান্ত, তুমি অহংকারী অনুপম, তুমি লোভী, তুমি কামুক, তুমি ক্রোধী। তুমি ক্ষমাহীন, অনুপম, স্বীকার করো। অনুপম, তুমি অশুচি। তোমার অশৌচ অন্তহীন। তোমার কালাশৌচের শেষ হবে না। অনুপম, তোমার সুখও নেই, তোমার শান্তিও হবে না।

অস্থিমজ্জা-বিদীর্ণ-করা উদ্দাম শীতল সেই প্রবাসী বাতাসে তোমার শ্রদ্ধার অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছো। স্মরণ করো অনুপম, স্মরণ করো—স্মৃতিকে অস্বীকার কোরো না, স্মৃতিতেই সত্য। সত্যেই মুক্তি।

পিতৃপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে সেই উন্মত্ত ফূর্তির পরে সরল মারিয়ার

বুকে মুখ গুঁজে ফুলকাকীর জন্য তোমার শোক—স্মরণ করো। সে কি শোক? নাকি, সে কামনা? সেই প্রচণ্ড সেলিব্রেশনের পরে আরো সেলিব্রেশন, আরো পাপ, আরো পাপ। মারিয়াকে, তোমার শয্যা-সঙ্গিনীকে, সারারাত্রি তুমি ফুলকাকী—ফুলকাকী—ফুলকাকী বলে ডেকেছিলে—তোমার পাপের শৌচ নেই। মার্জনা নেই। শোনো মারিয়া, আমি মহাপাপী। পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ—

—'বাবা, শুনুন, আমার পাপের শেষ নেই।'

আজ মারিয়ার কথা প্রবলভাবে উত্থিত হয়ে জোরে জোরে নাড়া দিতে লাগলো অনুপমের স্মৃতিকাণ্ডকে। ঝরে ঝরে পড়লো তীব্র বিষফুল। যার গন্ধ পর্যন্ত অনুপমের কাছে অসহ। সেই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল অনুপমের বর্তমানের সবটুকু জমি।

প্রথম বিলেতে পৌঁছে জাহাজ থেকে নেমে মনে হয় নি কোনো অসুবিধে হবে। জুটে গেল মারিয়ার বাড়িতে একটা ঘর—তখনও বাড়িউলিরা ছিল বিশেষ বর্ণ-বিলাসিনী, কালা-বাদামী-সফেদ নিয়ে ভাগাভাগি, রাগারাগির শেষ ছিল না। মারিয়া সফেদ, কিন্তু সেণ্ট্রাল য়ুরোপীয়ান জুইশ—ইংলণ্ডে সেও বিদেশী। তাই হয়তো বাদামী মানুষদের যত্ন করে ঠাঁই দিয়েছিলো নিজের বাড়িতে। অনুপমের সেই প্রথম যৌবন সদ্যজাগ্রত, আর মারিয়ার যৌবন তখন মধ্য গগনে। মারিয়া অসুন্দরী নয়, অবস্থাও ভালো, টুপি-তৈরির ব্যবসা আছে। বিয়ে একটা হয়েছিলো, বিচ্ছেদও হয়ে গেছে বহু দিন। গৃহবাসী প্রবাসী ছাত্রদের যথাসাধ্য স্নেহযত্ন করে সে। এই মারিয়ার শরণ নিলেন অনুপম।

দেশে থাকতে কখনো যা কল্পনা করেন নি, জাহাজে অনন্ত নীল জলরাশি আর কিনারাহীন আকাশের মাঝখানে ভাসমান অবস্থাতেও

যা কদাচ অনুভব করেন নি, সেই প্রবল, প্রখর, নিরাকার ও নিবৃত্তিহীন, অখণ্ড শূন্যতা তাঁকে আক্রমণ করলো এই জনবহুল, কর্মব্যস্ত লণ্ডন শহরে।

প্রথম প্রবাসের উত্তেজনা, রায়বাড়ির পরিবেশ থেকে মুক্তির প্রথম পাখামেলা দিবস রজনীগুলি কেটে যাবার পরে, তাঁর চোখ কেবলই খুঁজতো বাংলা ভাষা, বাঙালী মুখ। কিন্তু অভিজ্ঞতা অচিরেই তাঁকে ভিতর থেকে অন্য পরামর্শ দিলো। একগুচ্ছ বৃন্তহারা হৃদয় নিয়ে তোড়া বাঁধলেই নিজের বৃন্ত গঠন হয় না।

একাকিত্ব ঘোচাতে হলে অধিকারবোধ জন্মানো দরকার। কোনো পুরুষের ওপরে সেভাবে অধিকারবোধ জন্মানোর কথা ভাবতেই পারেন না অনুপম। সেই প্রথম তিনি নারীর প্রয়োজন, নারীর অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করলেন হৃদয়ে। জীবনে। এবং তারপরে শরীরে, বুদ্ধিতে। শুরুতে যেটা ছিলো নিরুপায় আশ্রয় গ্রহণ, ক্রমশ সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সচেতন শোষণ। শুরুতে যা ছিলো কাতর প্রণয় প্রার্থনা, ক্রমে তা-ই হয়ে উঠলো পোক্ত প্রণয়ীর ভূমিকাভিনয়।

মারিয়ার দৌলতে শুধু ওয়াইনিং-ডাইনিং আর সিনেমা-থিয়েটারই নয়, টাই-রুমাল থেকে শুরু করে ক্রমশ জুতো, শার্ট সবই আসতে লাগলো। আর্থিক, সাংসারিক কোনো উদ্বেগই থাকতে দেয় নি মারিয়া।

তার বুকের ওমের মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক সমতা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম পড়াশুনোরও প্রচুর সময় পেলেন। গড়ে উঠলো ঘরের বাইরে ঘর, স্বদেশের বাইরে স্বদেশ। মারিয়ার মধ্যে।

ক্রমে তুজনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বোধের সূক্ষ্ম কাঁটা, এই যুগ্ম জীবনযাত্রার একটা স্বাভাবিক সামাজিক ফলশ্রুতির ধারণা তু জনেরই মনে উঁকি দিয়ে

এক তীরে আলো, আর অন্য তীরে আঁধার বিছিয়ে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় আশা, অন্যত্র উদ্বেগ।

সদ্য যুবা অনুপম দু বছরে পূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছেন, আর মারিয়ার মধ্য-যৌবন ক্রমেই ঢলছে পশ্চিমে। ইতিমধ্যে তাঁর থীসিস টাইপ করতে শুরু করেছে মারিয়া। এটা তার সন্ধ্যাবেলার উপরি উপার্জনের পথ ছিলো। অবশ্যই অনুপমের জন্য অন্য ব্যবস্থা। কেবলই দিয়ে, দিয়ে, দিয়ে, তাঁকে আরো, আরো জড়িয়ে ফেলেছে মারিয়া। এবং সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার কৃপার জালে পাশবন্ধ জানোয়ারটি মুক্তির জন্য কেবলই ছটফট করেছে অনুপমের মধ্যে।

অনুপম বুঝেছিলেন রায়বাড়ির দেবশাসিত নিরিমিষ হেঁশেলে এই মধ্যবয়সিনী স্বাস্থ্যবতী ইহুদী কন্যার স্টিলেটো হীলের জুতো ঢুকবে না। কিন্তু কোনো জাদুমন্ত্রে তাও যদি বা মানিয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি করে যেখানে সে মানাবার নয়, তা হোলো অনুপম রায়ের জীবনে। তাঁর জীবনে অন্য এক ইচ্ছার শাসন অসম্ভব। মারিয়া, তোমার করুণায় কেনা দাস হয়ে আমি বাঁচতে পারবো না।

এত বেশি উপকার করেছো মারিয়া, যে আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না। আমার দুর্বলতম মুহূর্তগুলির সাক্ষী তোমার বুক। তোমার ওই বুক আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারবো না।

হঠাৎই মুক্তির অভাবিত সুযোগ এসে গেলো। দুম্ করে প্রেম করে পাড়ার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে, নিরু একটা ক্ষমাপ্রার্থী চিঠি লিখলো দাদাকে—বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েক পরেই। পাশ করে চাকরি একটা পাবামাত্র। সঙ্গে পাঠালো সালঙ্কারা নববধূর ছবি। ঠোঁটে তার সলজ্জ প্রেমের মুক্তোর নোলকটি ছুঁয়ে রয়েছে, চোখে সৌভাগ্যের সাতনরী সুখ ঝলমল করছে। বীথির ছবি। ছবিটা দেখেই চমৎকার একটি বিদ্যুৎ খেলে গেলো অনুপমের মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থে। এই তো মুক্তির পরওয়ানা। চার বছর কেটে গেছে।

ফেরার দিন বেশি দূরে নেই। থীসিস টাইপিংয়ের প্রথম ড্রাফট শেষ। ফাইনাল ভার্শন অন্যত্র টাইপ করাতে হবেই।

অনুপম ভাবলেন যা থাকে কপালে, দেখি একটা শেষ চেষ্টা করে।

প্রতিদিন টেবিল গুছিয়ে রাখে মারিয়া। বাংলা চিঠিপত্রগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রাখে একধারে।

অনুপম একটা চিঠি আরম্ভ করলেন এয়ার মেল প্যাডের ওপরে, যে চিঠির কোনো দিন শেষ হবে না—

কেবল ডান কোণে তারিখ আর ঠিকানা, এবং বাঁ দিকে একটি পাঠমাত্র ঃ 'Darling'. সেই ভাঁজের মধ্যে রাখলেন বীথির ছবিটি, আর প্যাড গুঁজে রাখলেন কিছু এলো-মেলো বই খাতার তলায় আলতো যত্নে, অতি-মনস্ক অনাদরে, নিশ্চিত দ্রষ্টব্য হিসেবে লুকিয়ে।

তারপর সারা দিনের জন্য তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে চলে গেলেন, কাজ করতে।

ঠিক যেটি ভেবেছিলেন সেইটি হোলো। রাত্রে বাড়িতে ফিরে দেখলেন কেঁদে কেঁদে মারিয়ার চোখমুখ ভিজে, মৌচাকের মতো ফুলো, লাল—অনুপমকে তার ঘরে পদার্পণই করতে দিলো না মারিয়া। একটা একটা করে ছুঁড়ে বাইরের দালানে ফেলতে লাগলো সে অনুপমের বই, খাতা, জুতো, শার্ট—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে ফোঁপাতে লাগলো, চ্যাঁচাতে লাগলো—'আই গুড্ হ্যাভ নোওন ইট···অল্ ইণ্ডিয়ান্স আর চীটস্···থীভস্···লায়ার্স ··'

অপরাধীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করলেন সেদিন অনুপম। মানভঞ্জনের পথে এগোলেন না। কি জানি, যদি ক্ষমাটমা করে বসে? যা পাগলের মতো প্রেমে পড়েছে মেয়েটা।—সামনে হাঁটু মুড়ে বসে, যখন তাঁর কাঁধ দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে আত্মহারা মারিয়া—'কেন বলোনি, দেশে তোমার বউ ছিলো? কেন বলোনি? কেন? কেন?

বলো, কেন বলোনি আমাকে?' তখন কেবলই মেঝেয় ছত্রাকার ছড়ানো শার্ট, প্যাণ্ট, জুতো, খাতা, বইগুলো ঝেড়ে বেছে ভাঁজ করে গুছিয়ে স্যুটকেসে তুলছেন অনুপম 'রয়', আর সংযত, শান্ত, ভদ্র গলায় পুনঃ পুনঃ বলছেন—'আহাঃ! হে মধুহৃদয়া, আমার প্রতি কর্ণপাত করো। প্রেয়সি, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। লেট মি এক্সপ্লেইন, ডার্লিং, লিসন টু মি, স্যুইটহার্ট!'

কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। একবারও খণ্ডন করলেন না মারিয়ার উন্মাদ অভিযোগের রাশি। বরং, 'ঠিক আছে, যখন তুমি শুনবেই না, তাহলে আমার আর বলেও কাজ নেই। এই আমি বিদায় হলুম, মারিয়া, ডার্লিং, আর কোনোদিনও তোমাকে বিরক্ত করবো না। অনেক ধন্যবাদ, এ্যাণ্ড লুক আফটার য়োরসেল্ফ—' এই বিদায় শুভেচ্ছাবাণীর সঙ্গে ক্ষুব্ধ আহত, প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের কুঞ্জবন পরিত্যাগের করুণ দৃশ্যে যবনিকাপতন হোলো। তল্পিতল্পা নিয়ে 'ভগ্নহৃদয়' 'রয়' জোফের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সকলেই শুনলো, অকারণে ঝগড়া করে মারিয়া 'রয়'-কে তাড়িয়ে দিয়েছে থীসিস সমাপ্তির সংকট-মুহূর্তে। অনুপমের বন্ধুদের মধ্যে সহানুভূতির বান ডাকলো—কি ইংরেজ, কি ভারতীয় প্রত্যেকেই বললো এই ইহুদী জাতটাই কত পাজী, কত অসার। মহামতি হিটলারের 'প্রণালী'টা কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত হলেও মূলতঃ তিনি যে 'ভুল' করেন নি—এই বিষয়েও আলোচনা কম হোলো না। অনুপম দেখেছেন, একটা সূত্র পেলেই হোলো, অমনি কি শাদা কি বাদামী কি কালো সব চামড়ার নিচে থেকেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে ইহুদী-বিদ্বেষের উইয়ে-খাওয়া মাটি। সেই উই-মাটিতে ঢেকে গেল মারিয়া এপস্টাইন।

না, এজন্য তিনি নিজেকে দোষী করেন নি। তাঁর কোনো বিবেক-যাতনা ছিলো না। মারিয়া কেনই বা অতোটা প্রেডিকটেবল হবে?

অতো ভাববেগ-প্রবণ ছকে-বাঁধা নির্বুদ্ধিদের কে বাঁচাবে ধ্বংসের হাত থেকে ?

মারিয়া, বোকা মেয়ে, এও বোঝোনি যে এতে তোমারই ভালো করা হোলো। তোমার সমাজে তোমার মুখটা রইলো। তোমাকে প্রত্যাখ্যাত রমণীর ভূমিকা না দিয়ে, তেজস্বিনী প্রত্যাখ্যানকারিণীর ভূমিকায় রাখলাম। একে কি কনসিডারেশন বলবে না ?

কনসিডারেশন বই কি ! ধরা যাক নলিনী দেশপাণ্ডের কথাই। সে যখন বোম্বাইয়ের বহুতল হোটেলের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে বলছে—'অনুপম, আমি কিন্তু এক্ষুনি ঝাপ দেবো'—সামনে কালো সমুদ্রের বুকে আলেয়ার মতো অলৌকিক চকমকির দিকে তাকিয়ে অনুপমের মন বলছিলো—'তাই দাও।' কিন্তু মুখ ? নলিনীর সামনে নতজানু অনুপম বললেন—'শোনো, নলিনী, শোনো, আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার শিশু দুটির কথা ভাবো। পাপ্পু-গুড্ডীর সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় আমাকে রেখে ছাখো, আমি কতো হাল্কা, কতো তুচ্ছ। তোমার জীবন অনেক দামী। নলিনী, তোমার ছেলেমেয়েদের মুখ মনে করো। কতো অনুপম আসবে-যাবে তোমার জীবনে, আমি কি এতই মূল্যবান ?' উন্মাদিনী, উগ্রচণ্ডা, অশ্রুরক্তাক্ত নলিনী তখন কাঁপা হাতে একটা দুর্বল চড় করিয়েছিলো অনুপম রায়ের মহার্ঘ কপোলদেশে। ফস্ করে বুকের মধ্যে ঝল্সে উঠেছিলো প্রচণ্ড ক্রোধ—কিন্তু আরো শান্ত, আরো মধুর স্বরে অনুপম বলেছিলেন—'মারো, যত খুশি আমাকে তুমি মারো নলিনী, বাট্ জাস্ট থিংক অফ পাপ্পু এ্যাণ্ড গুড্ডি !'—মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল নলিনী। উঠে দাঁড়িয়ে ডিক্যাণ্টার থেকে এক পেগ ব্রাণ্ডি গড়িয়ে এনে ঠোঁটের কাছে ধরেছিলেন অনুপম—'খেয়ে নাও তো, লক্ষ্মী মেয়ে, ইউ নীড ইট্, নলিনী !'

এক ঘণ্টা পরে মুখ ধুয়ে, মুখে চুনকাম রং তুলির কাজ মেরামত

করে নিয়ে নলিনী দেশপাণ্ডে একাই ফিরে গিয়েছিলো দীর্ঘ পথ—ম্যারিন ড্রাইভ থেকে পালি হিলস। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অনুপম রায় তখন কাগজপত্তর খুলে বসেছিলেন। পরের দিন সকাল নটায় তাঁর বক্তৃতা ছিলো।

অনেক বছর পর সুরেশ্বর বলেছিলো, মারিয়ার টুপির ব্যবসা উঠে গেছে। মারিয়াকে মাঝে মাঝেই নাকি একটা মেণ্টাল হোমে কিছু সময় কাটিয়ে আসতে হয়। সেই নার্ভাস ব্রেকডাউনটা ঠিক সামলে উঠতে পারে নি আর মারিয়া।

তুমি আত্মরক্ষার কৌশলাবলি শেখোনি কেন মারিয়া? ইট ওয়জ য়োর লাইফ আগেইনস্ট মাইন, মারিয়া। কলকাতায় তোমাকে নিয়ে এলে আজ আমার জীবন কেমন হোতো? তুমি হয়তো ভেসে উঠতে, কিন্তু আমি তো ডুবে যেতুম। জীবন বড়ো কঠোর মারিয়া, তুমি তো ডারুইন সাহেবের তত্ত্ব জানো। সে-ই টিঁকে থাকে যে সব চেয়ে বেশি যুঝতে পারে! আর যুদ্ধ মানেই কারুর বিরুদ্ধে লড়াই—সত্যি তো যুদ্ধক্ষেত্রে 'নির্বৈর' আমরা হতে পারি না, বরং বৈরী বানিয়ে নিই, জেতার প্রয়োজনে।

যুদ্ধ এড়াতে হলে বনবাসে যেতে হবে মারিয়া, সমাজ মানেই যুদ্ধক্ষেত্র। দু পক্ষই তো জয়ী হয় না, একপক্ষ হেরে যায়। কেউ জন্মায় খাদ্য হয়ে, কেউ বা খাদক। জগতে কেবল খাদকরাই বাঁচে। অথচ তোমরা তো লড়িয়ে জাত, টিঁকে থাকার বিদ্যে পৃথিবীতে ইহুদীদেরই সবচেয়ে বেশি জানা। সেই শিল্প তুমি কেন শেখোনি মারিয়া? তুমি দুর্বল। তাই তুমিই দোষী।

॥ ২২ ॥

ঘুম পাচ্ছে। এবারে হয়তো সত্যি ঘুমিয়ে পড়বো। রণক্লান্ত? আমার যুদ্ধ কিসের সঙ্গে? আমি যোদ্ধা, সন্দেহ নেই। নানা জটিল যুদ্ধপ্রণালী ব্যবহার করি জীবনে, সত্য। নিরু যা করে না। নিরুকে তো আত্মরক্ষা করতে হয় না, সে তো ক্ষত্রিয় নয়। আমাকেই সর্বক্ষণ বর্মচর্ম পরে থাকতে হয়। দিগ্বিজয়ে বেরুনোর দাম অতন্দ্র প্রহরায় থাকা। নিরু তো দিগ্বিজয়ে বেরোয় নি, নিরুদ্বিগ্ন গার্হস্থ্যে শাস্ত আছে। কিন্তু আমার যুদ্ধ কার সঙ্গে? লা-মাঞ্চার সেই মোহন পাগল আমি নই। আমার যুদ্ধ ঘাস, ভেড়া, উইনডমিলের বিরুদ্ধে নয়। মানুষের যুদ্ধ মানুষের সঙ্গে।

ভেবেই ভীষণ লজ্জিত হলেন অনুপম রায়ের শান্তিবাদী অন্তরাত্মা। আমার অভিযোগ তো সিস্টেমের বিরুদ্ধে। মানুষের বিরুদ্ধে নয়। তবে, কেন আমার এই অন্তহীন শক্রখণ্ডন? এ তো সিস্টেম বদলানোর সংগ্রাম নয়, এই অবিচ্ছেদ্য যোদ্ধবেশ, এ তো ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার প্রণালী। আমি কি তবে কাউকে ভয় পাচ্ছি? কাকে?

অনুপমের হাত-ঠোঁট দারুণ নিশপিশিয়ে উঠলো সিগারেটের আশ্রয় চেয়ে—কিন্তু চুলের মধ্যে মায়ের জাগ্রত হাত ক্রমশ মনে পড়িয়ে দিলো ডাক্তারী বারণ।

এই তো এইবারে শুরু হয়ে গেছে পাঞ্জার লড়াই। অনুপম, মুঠো এবার শক্ত করবে, না, মুঠো আলগা করবে?

যদিও এ খেলা তোমাকে খেলতে হচ্ছে নিয়তিরই পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মে, তবু একবার বিনীত চেষ্টা করে ছাখো। এবার বরং নীতি বদল করো। মানুষী যুদ্ধের নীতি এখানে চলবে না। কেননা শক্র

এখানে ভিন্ন গোত্রের। এখানে দর্প নয়। অনুপম, এখানে হয়তো বিনয়ই প্রকৃষ্টতর অস্ত্র। অনুপম, তোমার বিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তি কোথায় গেল? 'বুদ্ধৌ শহরণমন্বিচ্ছ'—বুদ্ধি খাটিয়েই এবারে বরং বুদ্ধিটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখো। গোঁয়ারের মতো একই অস্ত্রে যাবতীয় শত্রুকে পরাস্ত করতে যেও না। দেবতাদের তুষ্ট করে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, পাখি মারার ছররা দিয়ে যেমন বাঘ শিকার করা যায় না, এও তেমনি। এ নতুন যুদ্ধে তোমার চাই নতুন অস্ত্র। অনুপম, মাথা ঠাণ্ডা করো। বুকের ভেতরে হাত চালিয়ে দাও অনুপম, ছাখো তো খুঁজে, কী কী তোলা আছে সেখানে? কী কী অস্ত্র? কী কী ঐশ্বর্য? চলো অনুপম, ছাখো তো কোথায় আছে তোমার ছেলেবেলার শমীবৃক্ষ?

মাগো, তুমি কেতাবিবিদ্যেয় অশিক্ষিত, ঘরের কোণেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে জ্যাঠাইমার বিপুল বিক্রমের তলায়। অথচ কতো সহজেই বলতে পারলে,—'যাতে মন সাড়া দেয় না সে কাজ করতে নেই অনু', কতো সোজা করে বললে—'প্রাণ বাঁচানোর জন্যেও নিজের কাছে নিজের মুখ ছোটো করতে হয় না'—মা, তুমি কার কাছে এসব বিদ্যা শিখলে? আমি বললুম—'জ্যাঠাইমাকে তুমি সহ্য করো কী করে?' তুমি কতো অনায়াসেই বলে দিলে—'আহা, ও বেচারা দুঃখী মানুষ, সারাটা জীবনই ঠকে এলো, জানতেও পারলে না যে বটঠাকুর ওকে ঠকালেন। ওকে কখনো আরো দুঃখ দিতে আছে?' আমার বুদ্ধির বড়াই বৃথা। মা, আমি তো বুঝিনি এতোদিন যে জ্যাঠাইমাই কৃপার পাত্রী, তুমি নও। কোথায় পেলে তুমি ক্ষমা, করুণা, ধৈর্যের এই সব চোখা-চোখা তীরের গোছা?—মা! যা যা করতে নেই, তোমার অনু যে ঠিক তাই-ই করেছে। তোমার অনু যে তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে একবার নয়, বারবার বারবার নিজের মুখ নিজের কাছে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। মাগো, আমার ভ্রান্তির শেষ নেই, আমার ভীরুতার শেষ নেই।

সমীর, সোমেন, দীপু, বাদল, আশিস্—আমাকে কৃপা করো তোমরা। আমি তোমাদের ঘৃণারও যোগ্য নই। মারিয়া, নলিনী, কমলকলি, মেনকা, আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। আমি দুর্বল। আমি স্বার্থপর।

বাবা, আমার একমাত্র মুক্তির পথঃ আমি তো আপনারই সন্তান! রক্ত? রক্ত কি তার কাজ করবে না? ক্রোমোজোমস? অপি, চেৎ সুদুরাচারো···বাবা, মনে পড়ে, আপনি যে বলতেন, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি? বাবা, এই পাপী আপনারই সন্তান, এই হতভাগ্য কি বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না?

এবারে ঠিক এই নোংরা পোষাকটা খুলে ফেলে আমি আপনার মতো পট্টবস্ত্রে অবগাহন স্নানে যাবো বাবা, আমার সব অশুচিতা আপনার পবিত্রতায় ধুয়ে কি যাবে না?

মদীয় পিতৃদেব ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্য ভট্টশর্মণ, শুনুন—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এবার আমি নতুন করে শুরু করবো, আপনার চেনানো নক্ষত্রের আকাশ এখনও আমার অপরিচিত হয় নি, আপনার শেখানো গায়ত্রী আমি পৈতে ছিঁড়েও ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছি কৈ?

বিকেলে ফোন করে আমি ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা বেচে দেবো। বাবা, আমি ও পাড়ায় আর যাবো না।

অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

কিন্তু নিরু, তোর সেই সবুজ ঘুড়িটা, যেটা কেটে দিয়েছিলুম বলে তুই অমন অঝোর কেঁদেছিলি, সেটা তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না রে!

—'আপনার ফোন এসেছে, দাদাবাবু'। ছাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল অনুপমের। ঘুমোচ্ছিলেন? হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলেন। মাথার কাছে তো মা নেই। মা কি ছিলেন? মা এসেছিলেন কি আজ?—

'কত করে মা বারণ করলেন ডাকতে, কিন্তু ওরা বলছে ভীষণ আর্জেন্ট কল। কাগজের অফিস থেকে মিস্টার দস্তুর।'

ঘুমে ভারী পা থেকে মাথা পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। আর্জেন্ট? আবার কী হলো?

—'হ্যালো! মিঃ দস্তুর? রয় স্পীকিং। ইয়েস্?'

ফোন নামিয়ে রেখে অনুপম শুনতে পেলেন মার উদ্বিগ্ন স্বর। —'কি বাবা, কিসের অতো জরুরি ফোন বলতো? থাক, থাক, কথা বলিসনি, এই শেলেটে লিখে দে।'

অনুপম লিখলেন: 'নিরুকে একটা ফোন করো।'

—'কেন বাবা? খারাপ কিছু?' মা শ্লেট এগিয়ে দিলেন। অনুপম লিখলেন—'আমি নাকি একটা প্রাইজ পেয়েছি। ম্যাগসেসে পুরস্কার। দশ হাজার ডলার। প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা।'

—'হরে কৃষ্ণ হরে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। জয় রাধামাধব! ঠাকুর! তোমার দয়া!' শ্লেট চুলোয় গেল, ভাঙা গলায় ধমকে উঠলেন অনুপম রায়—

'এটা ঠাকুর দেবতার ব্যাপার নয়, কূটনীতির ব্যাপার। ভারতবর্ষকে একটা প্রাইজ দিতে হবে, দাও লাগিয়ে! মাত্র এই। আমার কোনই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নেই এতে।'

—'সবই ঠাকুরের দয়া, বাবা। ভারতবর্ষে তো আরো অনেক মানুষ ছিলো, আমার রোগাভোগা ছেলেটাকেই তারা বেছে নিলে কেন? অনু, মনে মনে তোমার বাবাকে প্রণাম করো বাবা, জয় রাধামাধব···'

অনুপমের মনে হোলো এখন নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করা কর্তব্য। দর্জিপাড়ার ঝুলকালিমাখা কড়িকাঠের নিচে, নোনাধরা দেওয়ালের মধ্যে, কিংবা চকমেলানো উঠনের ওপরে সেইটাই স্বাভাবিক হোতো। অনুপম খুব ইচ্ছে করলেন, আপ্রাণ

চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই প্লাস্টিক পেইন্টের ডিমের খোসা-রং গারদে, কার্পেটে পিছমোড়া মেঝেয় দাঁড়িয়ে তাঁর কটি এবং জানু শৃঙ্খলিত, শিলীভূত। দুর্লঙ্ঘ্য ললাট কিছুতেই ভূমিস্পর্শে রাজী হতে চায় না। অনুপম ভাবলেন আজ যদি তোমার জন্মদিন, কিংবা বিজয়াদশমী, কি নববর্ষ হোতো, তাহলে তো তুমি প্রণাম করতে পারতে? বৈষ্ণব-বাড়ির সন্তান, তোমার বিনয়ে এতো লজ্জা? প্রণামে এতো সংকোচ? তুমি না বলেছিলে, অয়মারম্ভ শুভায়? মনে করে নাও আজই বিজয়াদশমী, অনুপম, মনে করো, আজ তোমার জন্মদিনও—অনুপম, আজ কেন নববর্ষ নয়?

অনুপম ডাকলেন—'মা?'

চলে যেতে যেতে দরজা ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন বেলারাণী, পায়ের কাছে নিচু হয়েছে—ও কে? আমার অনু? অনুপম?

॥ ২৩ ॥

'দিউক্স এক্স মাখিনা'। কপিযন্ত্রে চড়ে স্বর্গলোক থেকে দেব-দেবীরা রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হন বরদান কিংবা শাপদানের উদ্দেশে। অথবা নায়ক-নায়িকাকে পরীক্ষা করার জন্য। অনুপম রায় এটা মনে করে মৃদু হাসলেন। আসন্ন সংকট থেকে নায়কের মুক্তি পাবার উপায় প্রায়শই এই দিব্য যন্ত্র। আবাল্য তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়ে আসছে। শেষরক্ষাটা হয়ে যায় ঠিকই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরাল থেকে সেই কপিকলের দড়িটা টানতে হয়েছে সদাসতর্ক অনুপমকেই স্বয়ং। ম্যাগসেসে তাঁর জীবনের বৃহত্তম দৈবযন্ত্র হয়ে মঞ্চে নেমেছে, তবে এর বেলায় তফাৎ দুটো। প্রথম তফাৎ এই: এবারে দড়িটানাটানির নেপথ্য দায়টা একেবারেই তাঁর নিজের ছিলো না। অন্তরালে আছেন আর কেউ। মা বলবেন,

রায়বাড়ির সর্বেসর্বা সেই মূককে-বাচাল-করা ম্যাজিশিয়ান রাধামাধব-জীউ দাঁড়িয়ে আছেন উইংসের আড়ালে দড়ি হাতে, ব্যগ্র, গলদঘর্ম, গলদকরুণা। কিন্তু অনুপম জানেন ব্যাপার আসলে কাক এবং তালের। র‍্যানডম ফোর্সের ব্যাপার। কিছু লোক যেমন দুর্ঘটনা-প্রবণ হয়, কিছু তেমনি আছে সৌভাগ্যপ্রবণ। যারা জুয়ায় জেতে, প্রেমেও জেতে। যাদের উপকার করতে আকুল দেবতারা হামেশাই, অন্তত কাপযন্ত্র ধার করেও, ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। অনুপম জানেন, তিনি এই ভাগ্যবানদের একজন। আজন্মই জীবন তাঁকে কুর্নিশ করে গেছে। জীবনের কাছে একটা স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট পেতে তিনি অভ্যস্ত। অতএব উদ্বেগের মুহূর্তে এই ম্যাগসেসের মোহরের থলি কুড়িয়ে পাওয়াটা তাঁর বিশেষ বিস্ময়কর লাগলো না।

তবে এবারটা সবই আলাদা। এটা ঠিক ভাগ্য না দুর্ভাগ্য বোঝা যাচ্ছে না। মজা একটা অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে আয়রণি এই, যে পুরস্কারটা যে-সে নয়, খোদ ম্যাগসেসের নামে। যে ভদ্রলোকের উগ্র দক্ষিণপন্থা বিশ্ববিদিত। কম্যুনিস্ট নিধনযজ্ঞ নিয়ে এককালে অনুপম নিজেই কি কম লেখালিখি করেছেন। অনুপমের সব মনে পড়লো। সেই ম্যাগসেসে। ফিলিপাইনসের টাকা মানেই ···আপন মনেই একটু হাসলেন মার্কসবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষক অনুপম রায়। ভাল! বা! বেশ! মজা মন্দ নয়। হা অনুপম! এবারের খেলা সত্যিই আলাদা!

কিন্তু এর তো প্রয়োজন ছিলো না।

দ্বিতীয় তফাৎ এটাই। টাকার ব্যবস্থা তো হয়েই গিয়েছে ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে। সমস্যা চুকে যাবার পরে কেন এই দেবতাদিগের মর্ত্যে আগমন? কী এর উদ্দেশ্য? অবশ্য এর ফলে, ধ্বক করে খেয়াল হোলো অনুপমের, ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা আর না বেচলেও চলবে। তাহলে এটাই বোধহয় উদ্দেশ্য? সুকুমার

চক্রবর্তীর সেই বক্রহাসি তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারলো না—সাধের ফ্ল্যাট আর বেচতে হলো না! মাত্র এই? এতোই সরল? নিশ্চয় কোনো গভীরতর ষড়যন্ত্র আছে—এটা বরদান, না শাপদান? না কি পরীক্ষা?

কি আশ্চর্য! এটাও খেয়াল হয়নি? অনুপমের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে গেলো। সুকুমার চক্রবর্তীর বক্রহাসির ভয় এখন, এই ম্যাগসেসে প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশ হয়ে যাবার পরে, আর তো থাকা উচিত নয়? এখন উনি ফ্ল্যাটটা যদি নাও কেনেন তবু তাতে তাঁর অক্ষমতা বোঝাবে না। তাঁর সামর্থ্য তো 'পাবলিক নলেজ' হয়ে যাবে অচিরেই।

তবে আর কি? মুক্তি! 'ক্যামেলিয়া এ্যাপার্টমেন্টসে' আর আর যাবেন না শ্রীঅনুপমকৃষ্ণ ভট্টশর্মণ। অবশ্য রায়বাড়িতে আর ফিরবেন না। এই সহজ বাঙালি মধ্যবিত্ত পাড়ায় যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। কে জানে, আস্তে আস্তে আবার হয়তো একদিন তাঁর 'ট্যাক্সী' শুনলেই মনে হবে—'ইষ্টিশান? না হাসপাতাল? ইমার্জেন্সি!'

ম্যাগসেসের টাকাটা সবটাই দিয়ে দেবেন। ফ্ল্যাটের টাকাতেই বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভালভাবে হয়ে যাবে।

পঁচাত্তর হাজার। প্রথমে খবর নিতে হবে ওটা ট্যাক্স ফ্রী নাকি। যদ্দুর মনে হয় তাই হবে, তবু আয়করের পাওনা যদি কিছু থাকে, হিসেব করে সেটা আগে সরিয়ে রেখে বাকিটা থেকে মারিয়া, তোমার মতো মেয়েদের জন্যে সরকার-পুলে একটা বেড—তাতে পনেরো, অম্বরের লীগাল এইডে জেল হাজতের তরুণ রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে পনেরো, মাদার টেরেসাকে অবৈধ মাতৃত্বের শিকারদের জন্যে পনেরো, আর, মূকবধিরদের ইশকুলে পনেরো—এই দিয়ে আমার ছুটি। যদি আরো কিছু বাঁচে, দিয়ে দিলেই হবে অন্ধদের ইশকুলে।

ইন্দ্রিয়-সংযম এক দুর্লভ দৈব—আর ইন্দ্রিয়শূন্যতা এক দুর্দৈব। জন্তুজানোয়ারেরও ইন্দ্রিয়াদি থাকে। চক্ষু-কর্ণ-বাক সেই প্রাথমিক জৈব দাবী। প্রাণীমাত্রের মৌল দাবী। 'বেসিক নীডস'। তার অভাব ভয়াবহ দুর্বিপাক।

বেসিক নীড। আচ্ছা, অজিতনারায়ণ কোথায় গেল? অজিতনারায়ণের 'বেসিক নীড'টা পূরণ করার সুযোগ আর হয় নি।

গড়িয়াহাটের মোড়ে ছিন্নভিন্ন ন্যাকড়াপরা, ধুলোকাদায় বিবর্ণ দেহ, ফুটো কেডস্-জুতো পায়ে যুবকটি একদিন এগিয়ে এসে পিচুটি-ভরা চক্ষু পাকিয়ে অনুপম রায়কে স-তর্জন প্রশ্ন করেছিলো:

—'কিরে? অনুপম রায় না? চিনতে পাচ্চিস?'

পরমাশ্চর্য অনুপম বলেছিলেন: 'কিন্তু আপনি?'

—'তুই আমাকে চিনবি না। আমি তোর ঢের লেকচার এ্যাটেনড করেছি। কিন্তু তুই ব্যাটা আমার একটাও লেকচার এ্যাটনড করিস না। আ'য়্যাম অজিতনারায়ণ চাউড্রি।'

—'আপনি কোথায়, মানে, লেকচারটা কোনখানে দ্যান?'

—'এইখানে এই রামকৃষ্ণ মিশনে, আবার কোথায়? এত ভালো হল কি আর ওয়ার্ল্ডে আছে? আমি কি বিবেকানন্দ দ্যাট দে উইল্ সেন্ড মি টু শিকাগো? নাকি, আমি সি আই-এর পয়সায় ট্র্যাভেল করবো? নো! নট্ মি! সেটি পাবে না।'—নিজের শীর্ণ বুকে টোকা মেরে চোখের কোণ দিয়ে প্রায় সাততলা উঁচু থেকে অনুপমের দিকে কৃপানেত্রে তাকিয়ে অজিত বলেছিলো—'আই এ্যাম আ সলিড পার্সন, টোটালি অনেস্ট। তোকে আমার প্রবন্ধগুলো দেখাবো। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল, নিউগিনি, জাপান, কোরিয়া—কোথায় না ছাপা হয় আমার প্রবন্ধ? সেইসব পড়েই তোরা যতো বই লিখিস। অথচ—' এখানে অজিতের ঠোঁটে অভিমান উথলোয়—

'অথচ একটা এ্যাক্‌নলেজমেণ্ট তো কোথাও দেখলাম না!' চোখে জল আসে-আসে দেখে ব্যস্ত হয়ে অনুপম বললেন—

—'তা আপনার প্রবন্ধগুলো কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে?'

—'কেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে? তাও জানো না? ন্যাকা? তাছাড়া আমার রেসিডেনসেও আসতে পারো। মোস্ট ওয়েলকাম।' —সামনের উঁচু বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অজিত বললে—'ঐ যে আমার রেসিডেনস। প্রত্যেক ঘরেই এয়ারকন্‌ডিশন লাগানো। অথচ কী আর বলবো ভাই অনুপম, বাথরুমের বড়ো অসুবিধা!'—ঘনিষ্ঠ সুরে গোপন কথা বলার মতো বললো অজিত—

—'এই আনসিভিলাইজড্‌ বর্বরদের মতো বাথরুমে যেতে বড়ো কষ্ট হয়! একটা ফ্লাশিং সিস্টেমওলা বাথরুমের বন্দোবস্ত করে দিতে পারো? একটা দরজা, ছিটকিনি, আর ফ্লাশিং সিস্টেম চাই। বলো দিকি, প্রিভেসি, আর স্যানিটারী প্রিভি—এগুলো সভ্য মানুষের বেসিক নীড কিনা?—আমার সেটাই নেই!'

অনুপমের হঠাৎ লজ্জা করলো—রাস্তার লোকেরা কি ভাবছে, একটা বদ্ধ পাগলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন অনুপম রায়। উনি 'আ—চ্ছাঃ' বলে যেই রওনা দিয়েছেন, অজিত ছুটে এসে তাঁর জামা টেনে ধরে বললো—

—'শোনো, আমার প্রেজেণ্ট পি-একে আমি ওয়ান থাউজ্যানড দিই, তোমাকে থ্রি থাউজ্যানড দেবো। আমার নেকস্‌ট পি-এ এ্যাপয়েনটেড হলে তুমি। অদ্য হইতে অনুপম, ইয়ু ল্‌ লুক আফটার মাই বেসিক নীড্‌স। ও কে?'

'বেশ তো, বেশ তো', বলতে বলতে তাড়াতাড়ি জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে পলায়ন করেছিলেন অনুপম।

তারপর থেকে গড়িয়াহাটে গেলেই অজিতের সঙ্গে দেখা হতো।

অজিত বলতো,—'ছাখো তো পি-এ, কী কষ্টে আছি। তুমি তোমার কর্তব্য করছো না। মোটেই তুমি আমার বেসিক নীড্‌সগুলোর খবরদারি করছো না।'

একদিন বললো—'পি-এ, হাজার দশেক টাকা দাও দিকিনি? আমাকে একটু কন্টিনেণ্টে যেতে হবে। রাসল আর সার্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে হবে, আর অমনি ব্রেণটাও ইনশিওর করিয়ে আসবো—মার্লিন ডিট্রিশের যেমন ঠ্যাং ছুখানা ইনশিওর্ড ছিলো মিলিয়ন ডলারে। সঙ্গে আমার পি-এ অর্থাৎ তুমিও যাবে। কই, ছাড়ো?'

অনুপম বলেছিলেন—'কিন্তু অজিতবাবু, বিশ্বাস করুন, দশ হাজার কেন, একটা টাকাও নেই আজকে আমার কাছে।'

—'ও কে, গিভ্‌ মি টু রুপীজ ফর দ্য টাইম বিয়িং!'

উত্তরে অনুপম তাঁর শার্টের পকেট উলটে দেখিয়েছিলেন। সেই প্রকট শূন্যতা দেখে অজিতের চোখে-মুখে আশ্চর্য মমতা ফুটলো।

—'আহারে, অনুপম রায়, তোরও এই অবস্থা? দীজ্‌ আর হার্ড টাইমস। দাঁড়াও, আই শ্যাল হেল্‌প য়ু।' তারপরেই শতছিন্ন ন্যাকড়ার ফালির পরে ফালি সরিয়ে কোমরে বাঁধা একটা পট্টি থেকে বের করেছিলো এক টাকার একটি ময়লা নোট এবং কিছু খুচরো। খুচরো দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ এক ঠোঙা মশলা-মুড়ি কিনলো—আর সারাক্ষণ অনুপমের টেরিলিন জামার কোণটা টেনে রাখলো—'পালাসনি, ছুটি খেয়ে যা—না খেলে ব্রেণটা ওয়র্ক করবে কেন?' নিজে এক মুঠো তুলে নিয়ে পুরো ঠোঙাটাই এগিয়ে দিলো অনুপমের দিকে। তারপরেই সেই ঘামে-ভেজা ছুর্গন্ধময় নোটটা খপ্‌ করে অনুপমের বিচলিত, সঙ্কুচিত ঘর্মাক্ত মুঠোয় জোর করে গুঁজে দিয়ে বল্ল—'কীপ দিস্‌, টিল্‌ য়ু সী বেটার ডে-জ।'

হলদে দাঁতের ছাৎলা দেখিয়ে খুব সহানুভূতির হাসি হেসেছিলো অজিতনারায়ণ চাউড্রি। রাজ্যের নীল বিষ নোংরা জমা লম্বা নোখে

ভর্তি ময়লা হাতে বাড়িয়ে-ধরা ঝাল-মুড়ির ঠোঙা থেকে কিছুতেই মুড়ি তুলতে সক্ষম হন নি অনুপম রায়। বিনীত অনুনয় করেছেন —'আমার পেটটা ঠিক নেই অজিতবাবু। ওটা বরং আপনিই খান।—'

—'ওঃ হো! এত অল্প বয়সে এই হজমশক্তি? এই আমাকে গ্যাখো দিকি?' হঠাৎ ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে দুই হাতে মুঠো মুঠো মুড়ি এতোল বেতোল মুখে পুরতে শুরু করেছিলো অজিত, কষ্ বেয়ে শাদা মুড়ি ছিটকে-ছটকে উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো. যেন উপ্‌ড়ে আসা দাঁতের মতো—মুড়ি বোঝাই মুখে খোঃ খোঃ করে হেসে উঠে অবজ্ঞায় হাত ঝেঁকে ঝেঁকে অজিত বলেছিলো ঃ

—'য়ু মে গো নাউ। য়োর সার্ভিসেস আর নো লংগার নীডেড। তুমি পারলে না। ইয় হ্যাভ ফেইলড।' কম্পিত চরণে এগিয়ে এসেছিলেন অনুপম রায়, ঘর্মাক্ত অঞ্জলিতে অজিতের নোটটি সচন্দন বিল্বপত্রের মতো ধরা—'এই টাকাটা আপনিই রাখুন বরং, বাড়িতে আমার টাকা আছে।'

—'সো? বাড়িতে টাকা রেখে আপিসে কেন শুধ্ হাতে আসো? টু বেগ, টু বরো, এ্যাণ্ড টু স্টীল? ও টাকা আমি নিচ্ছি না বাবা,—দিয়ে ফেরত নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় জানো না? আমি আয়েশি মানুষ—আই ক্যানট অপ্ট ফর আ ডগ্‌স লাইফ!'

হৈ-হৈ করে হেসে উঠে বাকি মুড়িটা গড়িয়াহাটের মোড়ে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছিলো অজিত—একদল শাদা পাখিকে মুক্তি দেবার মতো, স্বচ্ছ আনন্দে। অগুন্তি শুভ্র অন্নকণিকায় ভরে গেল গড়িয়াহাটের ক্ষুধার্ত আকাশ-বাতাস। আর ঐ মুড়ি···শিলাবৃষ্টির প্রচণ্ডতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুপমের বোধশক্তিকে বিকল করে দিয়েছিলো। টাকাটা অজিতকে কিছুতেই ফেরৎ নেওয়ানো যায়নি।

দরিদ্র বিধবার ছেলে, ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে

পড়তে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়, ওর মা ওকে ঘরে ধরে রাখতে পারেন নি। বাজারের দোকানীদের কৃপায় অজিতনারায়ণ ক্রমে হয়েছিলো গড়িয়াহাটের একচ্ছত্র অধিপতি।

ঐদিনের পরেই ত্রস্ত হয়ে এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে লুম্বিনীতে অজিতের ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন অনুপম রায়। যাতে ওর 'বেসিক নীড্'-গুলোর অসুবিধা অন্তত না হয় – 'প্রিভেসি, এ্যাণ্ড স্যানিটরি প্রিভি'। কিন্তু তারপরেই গড়িয়াহাট থেকে উধাও হলো অজিত। অনুপম রায়কে একটি টাকা দিয়ে অনন্ত ঋণী করে রেখে। সেই বোধহয় তাঁর প্রথম পরাজয়।

তারপর থেকেই উনি রাস্তায় পাগল দেখলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। খোঁজেন। অজিত নয় তো? তাঁর উত্তমর্ণ নয় তো? সে কি বলছে :

—'ইট্স আ ডগ্স্ লাইফ! আই হ্যাভ সাম বেসিক নীড্স!'

মুখে কথা বলা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মনে মনে কথা বলা তো বন্ধ হচ্ছে না। বরং ঢের বেড়ে গিয়েছে। টাকা জুটছিলো না, সে ছিলো এক জ্বালা। এখন টাকা বেশি হয়েছে। এ আরো যন্ত্রণা। কাগজে রেডিওতে খবরটা প্রকাশ হবার পরেই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে—জনগণের শুভেচ্ছাবাণীর বোঝা চাপবে কাঁধে। ঠিক এই সময়েই। ওঁর যখন কথা-কওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ! ফলে অপমানিত, ক্ষুব্ধ—শেষ পর্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ফিরে যাবে আজকের প্রীয়মান জনতা। যাক, যে সমস্যার সমাধান তোমার হাতে নয় -সে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করা বৃথা। হাতেই বা নয় কেন? উপায় আছে বৈকি! কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই হবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ব্যাখ্যাপূর্বক। ওতেই সামলে যাবে।

একটা কর্ম-তালিকা প্রস্তুত করা যাক। এইবারে যাবার ব্যবস্থা

করতে হবে। তিন সপ্তাহ এখন কথা বলা বন্ধ। তারপরেই যাওয়া। কী কী বন্দোবস্ত করতে হবে? মন একাগ্র করো অনুপম, মনের শৃঙ্খলা কই তোমার? বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। স্থিত হও, চুলোয় যাক অন্য চিন্তা। কাজ করো! কাজের চিন্তা করো। কী কী তোমার করণীয় আপাতত?

॥ ২৪ ॥

দিব্য, সম্পন্ন অন্ধকার। বেলা যদিও দ্বিপ্রহর, পর্দাটানা ঘরে মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা আর বিজন নৈঃসঙ্গ্য।

কেষ্টকে নিষেধ করা আছে, কেউ এলে যেন ডাকে না। খাতা পেন্সিলে টুকে রাখছে নাম ঠিকানা, অভিনন্দনের উত্তরে চিঠি দেবেন পরে অনুপম রায়। কিন্তু একটিও কথা নয়। প্রত্যেক বাক্য, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্বরযন্ত্রের আয়ু নিঃশেষিত হচ্ছে। ডাঃ রায়চৌধুরীর কড়া বারণ পরিপূর্ণ বাগবিশ্রাম ভিন্ন চিকিৎসা নিরর্থক।

হাতলের ওপর স্থাণু ডান হাত, চোখের ওপরে বাম বাহু ভাঁজ করা, অনুপম শুয়ে আছেন তাঁর মায়ের প্রিয় আরাম কেদারায়। মনে মনে কর্মতালিকা প্রস্তুতি শেষ। উঠে নোটবইতে লিখবেন: ১। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ২। এয়ার ইণ্ডিয়া, ৩। ভিসার ফর্ম, ৪। মেডিকেল সার্টিফিকেট, ৫। ছুটির আবেদন, ৬। নো-অবজেকশন লেটারের আবেদন, ৭। দস্তুরকে জানাতে হবে 'রয়জ কর্নার' ছ হপ্তা বন্ধ, ৮। রেডিওতে জানাতে হবে 'রয়জ কর্নার' আপাতত বন্ধ থাকবে অনির্দিষ্টকাল। যতদিন গলা না সুস্থ হয়।

অনির্দিষ্টকাল? যদি গলা আর সুস্থ না হয়? যদি গলা না ফেরে?···ধরো, যদি আরো কিছু না ফিরলো?

এমন তো হতেই পারে, অপারেশনের সময়ে আরো কিছু বেরুলো? যা ভাবা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি কিছু। তাছাড়া অপারেশন যে নির্বিঘ্ন, সরল এবং সফল হবেই তার কোনো গ্যারান্টি নেই। অন্তত ২০% রিস্ক যে কোনো অপারেশনেই থাকে। কেউ কেউ অ্যানাস্থেশিয়া থেকে আর জ্ঞান ফেরৎ পায় না, কারুর বা রক্তচাপ আকস্মিক অধঃপাতে চলে যায়। আর ফেরে না।

ধরো, যদি একটা অবাধ্য রক্তের ডেলা তোমার ধমনিতে উজান বেয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটতে শুরু করে, সেই তূরীয় যাত্রা রোধ করা প্রায়ই ডাক্তারির অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধরো যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে? ম্যালিগনেন্সির জন্য তোমাকে পরীক্ষা করা হয় নি।

কে জানে কোথায় কোন্ বিস্ময়, কোন্ শত্রুতা, কোন্ আকস্মিকতা ওঁৎ পেতে আছে। অনুপম, এ হোলো প্রকৃতির ব্যাপার—এ নন-হিউম্যান ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধ। বুদ্ধি এখানে কোনো অস্ত্রই নয়। একটি পুরোনো চলচ্চিত্রের দৃশ্য হঠাৎ ভেসে উঠলো চোখে। মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলতে বসেছেন রাজা। এ খেলা তোমার শেখা নেই অনুপম।

ধরো যদি অনুপম রায়ের এই মাঝবয়সী ক্লান্ত দেহটাই কেবল ও টি থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে? আপাদশীর্ষ তুষেল চাদরে মোড়া একটি বাতিল শরীর? কে ভার নেবে সেই নিরাবলম্ব, দাবীহীন প্রবাসী দেহের?

একঘর অনাত্মীয় শববেষ্টিত কোনো অজীবযোগ্য ডীপ-ফ্রীজের দেরাজে অনিশ্চিত কালক্ষেপ করবেন ভবিষ্যৎহীন ও বর্তমান-খোয়ানো একদার অনুপম কে রায়। যতদিন না মাননীয় ভারতীয় দূতাবাস নিজ দায়িত্বে একটা কিছু বিলি-ব্যবস্থা করছেন। নৈর্ব্যক্তিক, আইনসঙ্গত।

একটা ধবধবে থমথমে শাদা অট্টালিকার বিপুল অভ্যন্তর চোখে ভেসে উঠলো। করিডরের পরে করিডর…চারদিকে ঝকঝকে শাদা ঝিনুকের খোলের মতো ছাদ, দেওয়াল, মেঝে—যাতে ছায়া পর্যন্ত পিছলে যায়, লগ্ন থাকে না কিছুই। দরজা নেই। সেখানে মোড়ের পরে মোড়, বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে নগ্ন, একক, শুভ্র চাদর জড়ানো কোন মনুষ্য-শরীর? সেই চরাচরব্যাপী রূপোলি করিডরের ঝকঝকে রূপোলী নৈঃশব্দ্য স্তব্ধ-আয়ু জন-শূন্যতায় বিষম ভারী, বাতাসে এ্যানটিসেপটিক ওষধির তীব্র ওজন বাড়তে বাড়তে সমস্ত অক্সিজেন নিঃশেষ, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, আর তখনই জেগে উঠলো সেই ধাবমান পায়ের শব্দ। ক্রমবর্ধমান, প্রতিধ্বনিত, কৌটোর মতো বন্ধ বাতাসে সেই পলাতক পদশব্দের বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ বধির করে দিচ্ছে—দুই হাতে দু'কান চেপে ধরেছেন অনুপম—মুখব্যাদন করেছেন আর্তনাদের জন্য—হাতের পাতার স্বেদাক্ত জলজ স্পর্শ তাঁর অতীব উত্তপ্ত কানে শীতল ছ্যাকা লাগালো। অনুপম রায় জাগ্রত হলেন।

ওঃ কী গরম। খুলির মধ্যে যেন অগ্নিকাণ্ড চলছে…ঈশ্, কী অস্বস্তিকর দিবাস্বপ্ন! কী মরবিড চিন্তা করছো অনুপম? সামান্য একটা অপারেশন হবে, মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে কেন? ভয় পাচ্ছো? উদ্বেগ? ক্ষয়? ক্ষতি? যন্ত্রণা?—কূর্ম যেমন সর্ব অঙ্গ সংহরণ করে, তেমনি তুমি সকল প্রকার আবেগ সংবরণ করো। অনুপম, নিবাত দীপের শিখা যেমন কম্পিত হয় না, তুমিও তেমনি স্থির হও—বায়ুতাড়িত হোয়ো না। মনে রেখো বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য ··

তাই বলে একা একাই ঢুকে যেতে হবে অপারেশন থিয়েটারে? দরজার বাইরে অস্থির পদচারণা করবে না কেউ?

মা পড়ে থাকবেন দর্জিপাড়ায় রাধামাধবের পা ধরে। নিরু?

ও বাবা! বীথির সন্তান জন্মের সময়ে নিরুর সে কী অবস্থা! প্রসববেদনা যে কার উঠেছিলো, পিতার, না মাতার—তাতে তো সংশয়ই জন্মে গিয়েছিলো ডাক্তারের! না, সংকট মুহূর্তের সঙ্গী নয় নিরু। তাহলে? তবে কি কেউই থাকবে না, দূর প্রবাসে, তাঁর আরোগ্যশয্যার পাশে? আর ধরো যদি সেটা 'আরোগ্যশয্যা' নাই হয়?···বলা তো যায় না, প্রত্যেকটা মেজর অপারেশনেই একটা এলিমেণ্ট অফ রিস্ক থাকে।

দূর! কী যে হয়েছে ইদানীং অনুপম, তোমার। আস্তাকুঁড়ে যেমন ভিড় জমায় ঘেয়ো কুকুর, রুগ্ন শরীরে তেমনি ভিড় করে রুগ্ন মনন। মরবিড চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় ইচ্ছাশক্তির বলপ্রয়োগ। চেষ্টা করো অনুপম, সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ, সুস্থ চিন্তা করো। এ ক্ষমতা তোমার আছে। থিংক অফ মোর ইউজফুল থিঙস, নিজেকে অযথা প্রশ্রয় দিও না!

[কুনো অনুপম এই সময়ে ফের খুক-খুক করে হাসলো। মৃত্যু-ভাবনা মরবিড, সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃত্যুকে সামনে দেখেও না চিনতে পারাটা? সেটা বুঝি স্বাভাবিক? সুস্থ চিন্তা? সুধা বললো: সব রকম সত্যের জন্যই তৈরি থাকা উচিত।—ঐসব আসলে আপনার সত্যকে এড়িয়ে চলবার কারচুপি। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু, এটা তো সায়েন্টিফিক ট্রুথ?]

থিসিয়ুসের গল্পটা মনে পড়ছে। আমারও অমনি একটা সুতোর গুলি চাই। মুঠোর মধ্যে সুতোর গুলিটা না নিয়ে আমি ভিয়েনায় ওই লাবিরিনথে ঢুকতে পারবো না, ঢোকাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। বাবা, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি ভীরু, আমি অধীর, আমি ফলাকাঙ্ক্ষী, আমি পারিনি। আমি ছোটো থেকে জ্যাঠামশাইকেই জেনেছিলাম বুদ্ধি-নির্ভর আদর্শ মানুষ। কিন্তু ও সুতোর গুলিটা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে বাবা।

এখন আমার আর একটা সুতোর গুলি চাই। মিনোটরের মুখোমুখি হবার মতো অস্ত্রবল আমার আছে, কিন্তু তারপর? বাড়ি ফেরার রাস্তা কে আমাকে বলে দেবে? আপনিই বলুন, উত্তরণের সূত্র না রেখে গোলকধাঁধায় প্রবিষ্ট হওয়াটা কি সমীচীন? জানি, আপনি নিজে তা পারতেন। আপনার উপবীতেই যে ছিলো নিশ্চিত উত্তরণের সূত্র।

কিন্তু আপনার তুলে দেওয়া সেই সুতোর গুলিটা ছেলেবেলাতেই যে আমি ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। আর সে আমার মুঠোতে ফিরবে কি? উত্তরণের উপায় আমাকে আজ নতুন করে অধীত হতে হবে। আমার সত্যকার উপনয়ন এতদিনে সমাগত। বাবা, এবারে আমি উপনীত হবো।

২৫

অনুপম রায়ের সজ্জিত, পরিচ্ছন্ন, রুদ্ধদ্বার ঘরে, দামী পর্দার ভারী ফাঁদে পড়ে মধ্যদিবসও মধ্যরাত্রির মতো অসহায়।

পা দুটো সামনে মোড়াটায় তুলে দিয়ে, আরো একটু পিছন হেলে শুলেন অনুপম। তামাটে, রোমশ সুঠাম বাহুর খিল তোলা রইলো চোখের পাতায়। অন্য হাতটি তেমনিই হাতলে ঘুমন্ত।

…মনে মনে উঠে গিয়ে রাইটিং ব্যুরোর দেরাজ টেনে এয়ার লেটারের প্যাডটা বের করলেন…মনে মনেই খুলে ফেললেন পর্বতের নামে যার নাম সেই প্রিয় কলমের টুপি…চোখের পাতা খুললো না, হাতও নড়লো না, শরীর স্থির হয়ে রইলো, খাট-পালংক আদি অন্যান্য আসবাবের মতো, নিশ্চল।

কেবল ওষ্ঠাধর। সরু গোঁফের পুরুষালি ছায়ায় পাতলা দুটো ঠোঁটের পাতায় প্রাণবায়ু কাঁপতে লাগলো, থিরথির, খুব অল্প, খুব

আস্তে, ইষ্টমন্ত্র জপের মতো গভীর নিবিষ্ট আত্মসমর্পণে, যেন কেউ না দেখে ফেলে, যেন কেউ না জানে···বিনা কলমে, বিনা কাগজে, বহু যত্নে অনুপম চিঠির খসড়ায় ডুব দিলেন, মনে মনে—

সুধা,

উত্তর দিচ্ছি ভেবে অবাক হোয়ো না। তুমি কেমন আছো সুধা ? আমি ভালো নেই।

সামনের মাসে ভিয়েনাতে আমার একটা অস্ত্রোপচার হচ্ছে। সামান্য ব্যাপার। তারপরে আমার স্বরশক্তি ফিরতে পারে, নাও ফিরতে পারে। আমি এখনই আর কথা কইতে পারি না. সুধা। কোনোদিনই কি পারতাম ? হয়তো পরে পারবো কিম্বা হয়তো তার প্রয়োজনই হবে না। ধরো যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি হয়, আর যদি আমি না ফিরতে পারি, কেউ তো অবশিষ্ট আমি-টাকে ফিরিয়ে আনবে ?

সুধা, ধরো, যদি আমি নিজে আর পথ চিনতে না পারি, তুমি আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবে না ? না' বোলো না সুধা, বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো নিঃস্বপ্ন, বড়ো নিঃস্ব এই আমি, অনুপম।

সুধা, শুনছো, যদি পথ হারিয়ে যায়, তবুও আমাকে ফিরতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো, আমাকে পরিত্যাগ কোরো না, সুধা, আমাকে চিনছো ? আমি···অনুপম।

সুধা, এটা কিন্তু তোমার উত্তর নয়। এটা আমার চিঠি। দূর, এরকম চিঠি কেউ লেখে ? এরকম চিঠি কখনো লেখা যায় ? না, যায় না। আমি পারব না। বাবা, আমাকে অন্য একটা সুতোর গুলির সন্ধান দিন। সুধা নয়। [কুনো অনুপম বললো—কেউ নেই। অন্য কেউ নেই। আর কোনো বিকল্প পথ নেই তোমার। সুধা একমাত্র।]

ও কী···ও কে ?···কে ওখানে ?

ভয়ানক চমকে উঠলেন অনুপম রায়। এই নিঃসময়-তরঙ্গিত শব্দহীনতা ভেদ করে দরজায় কি টোকা পড়লো এইমাত্র ?

রুদ্ধশ্বাস, শ্রবণসর্বস্ব অনুপম শুনছেন, হ্যাঁ। টোকা পড়ছে।

একবার। দুবার। তিনবার।

তিনটে টোকা। কিছু সময় চুপ। অনুপম গুণছেন। আবার তিনবার। ভিতরে কানায় কানায় ভরা উদগ্র নিঃসঙ্গতা ছলকে পড়লো বাইরে—

—'কে ?'···প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন রুদ্ধবাক, ভগ্নকণ্ঠ অনুপম রায়।

—'আমি, চা এনেছি !' বিস্মিত উত্তর এলো কেষ্টর।—'ভেতরে আসবো ?'

—'ওহ্।' যেন কোন যুগান্তব্যাপৃত মোহনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে অনুপম আস্তে আস্তে ডাকলেন :

—'ভেজানো আছে। ভেতরে আয়।'

ট্রে নামাতে নামাতে কেষ্ট বললো :

—'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি ?'

—'না তো।'

—'তবে ? কাজ করছিলেন ?'

—'নাঃ। কেন ?'

—'কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি। সাড়া শব্দ কিছুই নেই।'

অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন অনুপম —'খেয়াল করিনি রে কেষ্ট।'

লজ্জা পেয়ে গিয়ে কেষ্ট বললো :

—'না না, কথা কইবেন না, আমি ভাবছি কী হলো আবার···'

তারপরে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেয়ে কেষ্ট আকস্মিক উদ্যমে সড়সড়

করে টেনে ভারী পর্দাগুলো একপাশে সরিয়ে দেয়, খড়খড়ির ছিটকিনি খুলতে লেগে যায়।

—'জানলাগুলো খুলে দিচ্ছি, রোদ কখন পড়ে গিয়েছে। বিকেলবেলার বাতাস দিচ্ছে বাইরে।'

মুহূর্তেই আকাশ এসে ঘরের পূর্ণ অধিকার নিয়ে নেয়। এক ঝলক শেষ বেলার রোদ্দুরে হঠাৎ ঝলসে যান অনুপম রায়। সেই অলৌকিক অগ্নিকাণ্ডে কেষ্টর চোখ ভয়ানক ধাঁধিয়ে যায়। পড়ন্ত সূর্য অনুপমের চুলে, কপালে, চোয়ালে, নাসার সুস্পষ্ট রেখায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের সদ্য-গড়া ভাস্কর্যের মতো ধাতব অগ্নিময় সেই দৈবী মূর্তিতে অনাত্মীয় বিভা···

সেই তপ্ত প্রখর দৃশ্য কেষ্টর স্নায়ুজালের মধ্যে জট পাকিয়ে দিলো, চোখে ঝিঁ ঝিঁ ধরালো, ঘর ছেড়ে পালাবার জন্য পাশ ফিরতেই কেষ্টর নজর পড়লো অনুপমের মুখের ঘরোয়া দিকে। ছায়াময় নিদাঘক্লান্ত চামড়ায় যেখানে ফুটে আছে ইতস্ততঃ দানা দানা ঘাম।···

জোর করে টিপে রাখা চোখের কোণে বয়সের কাটাকুটি খেলা, কুঁচকে থাকা ভুরুর ওপারে সৈকতের মতো কপাল কাঁকড়ার শব্দহীন চলে-বেড়ানোর সূক্ষ্ম, সহস্র রেখায় রেখায় ভরা, গালে বৈকালিক দাড়ির ধূসর চন্দনের ফোঁটা, নাকের পাশ দিয়ে ক্ষতচিহ্নের মতো গভীর অবসাদের ভাঁজ নেমেছে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত ··ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে· যেন স্বপ্নে দেয়ালা করছে শিশু·· বিষণ্ণ? নাকি তৃপ্ত?···

কেষ্ট নিচু হয়ে অতি সাবধানে, দুর্মূল্য কাচের বাসন নাড়াচাড়া করার মতো সন্তর্পণে, খুব আস্তে ডাকলো—'দাদাবাবু?' কোনো

সাড়া এলো না। কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, শব্দ না করে ঘর ছেড়ে গেল সে।

খালি ঘরে, খোলা জানলায় প্রবেশ পেয়ে বিকেল বেলার বাতাস অনুপমের অস্থিমজ্জায় চিরকালের নিয়মে স্বচ্ছন্দ বিহারে মাতলো।